শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা

১৮০-র অভিমুখে

সংকলক : অর্ণব নাগ



শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা

১৮০-র অভিমুখে

সংকলক

অর্ণব নাগ

সূত্রধর

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের
সংঘাধ্যক্ষ
পরমপূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দের
করকমলে

SRI RAMAKRISHNA CHARCHA : EKSHO ASHIR ABHIMUKHE
Compiled by Arnab Nag
Published by Sutradhar
47/B Bose Para Lane, Ground Floor, Baghbazar
Kolkata 700 003

₹ 250.00

প্রকাশ : ৬ মে ২০১৫ । ২২ বৈশাখ ১৪২২

প্রকাশ-স্থান ও উপলক্ষ : ছাতুবাবু-লাটুবাবর বাড়ির সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরদালানে
(৬৭ই বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬) 'শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা : ১৮০-র অভিমুখে'
শীর্ষক চারদিনের কার্যক্রমের সূচনা-দিন

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ রূপায়ণ : সৌরীশ দে

সকৃতজ্ঞ :
অলোক রায়, তরুণ গোস্বামী, নিতাই দলুই, নিমাই দে
প্রসেনজিৎ কর্মকার, মহেশ্বর ভট্টাচার্য, সনৎ দলুই ও স্বরূপ দত্ত
এবং
উদ্বোধন পত্রিকা

বিনিময় : ২৫০.০০ টাকা

সূত্রধর-এর পক্ষে সুমন ভৌমিক কর্তৃক ৪৭/বি বোসপাড়া লেন, একতলা, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত ও ফটিক জল প্রকাশনী, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে বর্ণসংস্থাপিত, বর্ণসংশোধিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ : ৯৯০৩৯ ৮০৫৪৪ / ৭০৫৯৬ ১২৭৩৬

বি ন্যা স

জবাবদিহি এক্ষেত্রে অনিবার্য। সোৎসাহী—পাঠকদের কাছে এই মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে বইয়ের সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। তাহলে সেই তালিকায় আরও একটা সংযোজন কেন? শুধুই কি গ্রন্থসংখ্যা বাড়ানোর নেশায়? নাকি ভক্তমণ্ডলীকে আরও একবার ভক্তিরসে ভাসিয়ে দেবার তাগিদে আমাদের এই গ্রন্থনা? না এ-সবের কোনোটিই নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যাটালগ বা পঞ্জিতে অহেতুক বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষপাতী আমরা নই। দ্বিতীয় কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-প্রচারের দায়ও আমাদের নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা এই ভাবান্দোলনের প্রচার ও প্রসার—আমাদের অংশগ্রহণ করা, না-করার ওপর কোনোমতেই নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ইতিহাসের দায়, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহনের যে দায়িত্ব তা আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারি কি? বোধহয় না। এখানেই এই গ্রন্থনার প্রাসঙ্গিকতা বিচার্য।

একথা অনস্বীকার্য যে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা রামকৃষ্ণকে নিয়ে প্রচারে না নামলে দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা ঠাকুর' কলকাতার সমাজে সমকালীন সময়ে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতেন না। এর পরবর্তী পর্যায়ে সাবেক সুতানুটির কিছু বিশেষ অঞ্চল (যেমন বাগবাজার পল্লি, সিমলা ইত্যাদি) এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় (যেমন কাশীপুর, বরাহনগর, আলমবাজার ইত্যাদি) সীমাবদ্ধ একটি ভাবান্দোলন কীভাবে নিখিল বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেল তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণপন্থীরা যে যানে চড়েছিলেন তার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোৎসব। মনীষী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—বাঙালি তথা ভারতীয়ের জন্মদিন পালন কোনো ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয়। কিন্তু জন্মতিথি থেকে ক্রমশ তা জন্মোৎসব হয়ে জন্ম-মহোৎসবে পরিণত হওয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে একটি ভাবান্দোলনের ক্রমশ জগতে পরিব্যাপ্ত হওয়া—এই

লাগিলাম, কলের পুত্তলিকার ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তালে তালে নাচিতে লাগিলাম। হরিনামের জয়ধ্বনিতে দিক্‌সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহসূচক ভাব কোটিগুণ পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। কেহ উর্ধ্ববাহু হইয়া, কেহ করতালি দিয়া, কেহ লম্ফে-ঝম্ফে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ ভাবে প্রেমে বিগলিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ মাতোয়ারা হইয়া হাসিতে হাসিতে অন্য ভক্তের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ উচ্চ ক্রন্দন করিয়া পরক্ষণেই অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন, এমন হাসি আমরা কখনও দেখি নাই, প্রলয়ের জল স্রোতের ন্যায় প্রবাহ হইতে লাগিল। সকলেই পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, ক্রমে সংকীর্তনের বিরাম হইল।

সংকীর্তন সমাপ্ত হইবার পর যখন নিম্নলিখিত গানটি হইল—

তুমি সর্ব্বস্ব আমার প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমাবিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।। ইত্যাদি।

"তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহির্জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছাড়িয়া চিদাকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জড়বৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরনেত্রে বসিয়া রহিলেন, মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ, এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইল, আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। সেদিনের ছবি অদ্যাপিও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।"

(*ভক্ত মনোমোহন*, উদ্বোধন, ১৩৫২ ব., পৃ. ৮০-৮২)

এ তো গেল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালনের সূচনা'র কথা। এর পরের বছর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন, জন্মোৎসব উদ্‌যাপনে রূপান্তরিত হল। সে বছর অর্থাৎ ১৮৮২ সালের (বাংলা ১২৮৮) ১৯ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন) রবিবার দিনেই পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। ফলে তিথি-র দিনেই উৎসব আয়োজিত হয়। তাই অনেকেই দ্বিতীয় বছরের শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালনকেই প্রথম জন্মোৎসব বলে মনে করেন। আসলে প্রথম বছরে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে কয়েকজন মাত্র ভক্ত মিলে ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজন করার পর তাঁরা ঠিক করেছিলেন জন্মতিথি সপ্তাহের যে-কোনো কাজের দিন-ই পড়ুক না কেন, তার পরবর্তী রবিবারে ছুটির দিনে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বড়ো করে তাঁর জন্মোৎসব পালন করবেন। কিন্তু তৃতীয় বছরেও (১৮৮৩) রামকৃষ্ণের জন্মতিথি (১১ মার্চ) ছিল রবিবার। ফলে তিথি-র দিনেই

দৃষ্টান্ত বিরলতম। আর এখানেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহনের তাগিদ, ইতিহাসের অনিবার্যতা রক্ষার দায়বদ্ধতাও বটে

কাহিনি-র সূত্রপাত ১৮৮১ সালের ২ মার্চ (২০ ফাল্গুন, ১২৮৭)। দিনটা ছিল বুধবার। ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ছেচল্লিশতম জন্মতিথি। তাঁর রসদ্দার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যোগে রামকৃষ্ণদেবের প্রথম জন্মতিথি পালিত হয় দক্ষিণেশ্বরে। ১৩নং সিমুলিয়া স্ট্রিটের বাসিন্দা সুরেন মিত্তির একাই সে বছর উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। তাঁকে এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছিলেন সুতানুটির অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বাসিন্দারা যেমন বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ মুস্তাফি, মনোমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে *ভক্ত মনোমোহন* গ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মমহোৎসবের গোড়াপত্তনের বর্ণনা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কারণ রামকৃষ্ণদেব তখন স্থূলশরীরে অবস্থান তো করছিলেনই উপরন্তু ভক্তমণ্ডলী-কে ভাবস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণও যে তখনই!

এহেন বিবরণ হাতের কাছে সবসময় মেলে না। তাই আমাদের প্রেক্ষিত বিচারে এর আলাদা তাৎপর্যও রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মতিথি পালনের মর্মস্পর্শী বর্ণনা :

মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের যত্নে ও ব্যয়ে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয়। আমরা সেই দিবস কয়েকটি মাত্র বন্ধু-বান্ধব সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করি। পরম তেজস্বী ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত তখন নিম্নলিখিত গানটি ধরিলেন—

"সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে!
প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। (বুঝি)
(তা নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে)
(নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে)"

সিংহের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, সিংহ বিক্রমের মধ্যে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ক্ষণে জ্ঞান এবং ক্ষণে অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, দরদরিত প্রেমাশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। আমরাও আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে

তবে বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার আগে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মূলত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে সুতানুটির বাসিন্দা গৃহীভক্তদের মধ্যে। রামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের এ-পর্যন্ত সংগঠকের ভূমিকায় সেভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু স্বামীজি'র পাশ্চাত্য বিজয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবকে নিয়ে একটা আলাদা উন্মাদনার সৃষ্টি হল। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালের বিভিন্ন সময়ে বিবেকানন্দের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে বিষয়টির আলোকপাতে বোঝা যায় তাঁর ভাবনাচিন্তাতেও এই বিষয়টি কতটা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই পর্বে স্বামীজি'র লেখা যে যে চিঠিতে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের প্রসঙ্গ দেখা যায়—তার একটি তালিকা পেশ করলাম। উৎসাহী পাঠক স্বচ্ছন্দে এগুলি দেখে নিতে পারেন।

চিঠির তারিখ	**কাকে লেখা**	**আকর সূত্র**
১৮৯৪ (গ্রীষ্মকাল)	মঠের সমস্ত গুরুভাইদের উদ্দেশ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা	'বাণী ও রচনা' ষষ্ঠ খণ্ড
২২ অক্টোবর, ১৮৯৪	তদেব	'বাণী ও রচনা' সপ্তম খণ্ড
নভেম্বর, ১৮৯৪	স্বামী অভেদানন্দ	তদেব
১৮৯৪	আলমবাজার মঠবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা	তদেব
১৮৯৫	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	তদেব
১১ এপ্রিল, ১৮৯৫	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	তদেব
৯ অগাস্ট, ১৮৯৫	ই. টি. স্টার্ডি	তদেব

বিবেকানন্দের এই সমস্তে চিঠিপত্রে দেখা যায় রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব তাঁর মানসলোকে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই হয়তো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কারণ রামকৃষ্ণ ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে তাঁর জন্মোৎসবকে ব্যবহার করার গুরুত্ব তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল। এটাও ঠিক যে, প্রাক্-চিকাগো পর্বে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু ভক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (ই. টি. স্টার্ডিকে লেখা চিঠিতে যে কথা বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন; তবে সূচনা-পর্ব থেকে ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দের চিকাগো-বক্তৃতার আগে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ

ভক্তেরা সমবেত হয়ে উৎসব করতেন। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন তাঁর জীবদ্দশাতেই জন্মোৎসব উদ্‌যাপনে পর্যবসিত হচ্ছিল। রামচন্দ্র দত্ত-কে উদ্ধৃত করে *ভক্ত মনোমোহন* গ্রন্থের দাবি নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে উত্তরকালের বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বছরের (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রি.) উৎসবে হাজির হয়ে 'চিন্তয় মম মানস চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' গানটি গেয়েছিলেন। যদিও *শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা* (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) বলছে যে, নরেন দত্ত এই অনুষ্ঠানে মোটেও উপস্থিত ছিলেন না।

এহেন অনুষ্ঠান আয়োজনের মুখ্য ব্যয়ভার সুরেন মিত্তিরকেই বহন করতে হত। তবে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বছর (১৮৮২ বা ১৮৮৩) থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীর প্রস্তাবমতো সকলেই কিছু না কিছু খরচ জোগাতেন। তবে এই পর্যায়ে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সামলাতেন মুখ্যত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন ক্রমশ যে জন্মোৎসবে পর্যবসিত হচ্ছিল তা চূড়ান্ত রূপ পেল এর চতুর্থ বছরে অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে। যে বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি কিন্তু তাঁর হাত ভেঙে যাওয়ায় তখন জন্মোৎসব পালন করা যায়নি। সেটি হয় পরে, ২৫ মে রবিবারে। এভাবেই সেই সময় থেকে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন ও জন্মোৎসবের আয়োজন দুটি ভিন্ন খাতে বইতে লাগল।

কথামৃতে ১৮৮৩ সাল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের বিভিন্ন বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ-বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ *লীলাপ্রসঙ্গে*-ও মেলে। এমনকী ১৮৮৬ সালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যাতেও নমো নমো করে হলেও পালিত হয়েছিল তাঁর জন্মোৎসব। আমরা এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোসবের ইতিবৃত্ত রচনা করতে বসিনি। এই কাজটি করে গিয়েছেন স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ (দ্রষ্টব্য : 'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব : তার ইতিবৃত্ত'; উৎস : *শ্রীরামকৃষ্ণ : চিন্তনে ও মননে*, উদ্বোধন, ২০১১)। আগ্রহী পাঠকেরা নজর দিলেই আমাদের কৈফিয়তের মূল সূত্রটি বুঝতে পারবেন। এঁদের ফের স্মরণ করিয়ে দিই, আমাদের দায় কেবল ইতিহাসের দায়বদ্ধতা মেটানোর।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে গুজরাটি, মারোয়াড়ি, শৈব, তান্ত্রিক, রামাইত সম্প্রদায়ের ভক্ত, কে নেই তাতে!

এহেন 'সুরেন্দ্রর পট' যে সুগভীর ভাবব্যঞ্জনাময় তাতে কোনো সন্দেহই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসঙ্গমে শুধু পৃথিবীর মূল ধর্মগুলোই মিশে যায়নি, আমাদের বহুধাবিভক্ত, সম্প্রদায়-কোন্দলে দীর্ণ হিন্দুধর্মও এখানে তার প্রকৃত আশ্রয় খুঁজে তো পেয়েই ছিল, এমনকী জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপেও স্বীকৃতি পেতে তার দেরি হয়নি। এই প্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ (১১ ফাল্গুন, ১৩৪২) শুরু হয়ে দীর্ঘ এক বছর ধরে চলেছিল এই উৎসব। ১৯৩৭ সালের ১-৮ মার্চ কলকাতার বুকে আয়োজিত হয়েছিল ধর্মমহাসভা। ইতিপূর্বে ৩১ জানুয়ারি হিন্দু, জৈন, শিখ, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মের প্রতীক নিয়ে মহানগরী-তে দীর্ঘ শোভাযাত্রা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্যই ছিল নিখিলবিশ্বকে হিংসা, দ্বেষ, বিভেদ, হানাহানি ভুলে আগামী দিনের দিশা দেখানো। আর এ-কাজে আয়োজকদের প্রধান সহায়ক হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবধারাই। সুতানুটির একটি পটের ভাব ক্রমশ আবিষ্ট করছিল জগৎ-সংসারকে।

সমকালীন সংবাদপত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব দেশে-বিদেশে কী বিপুল আলোড়ন ফেলেছিল। আমরা সেই মহাভারতের প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। শুধু আমাদের কয়েকটি দরকারি তথ্যের দিকে এক্ষেত্রে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব। ধর্মমহাসভায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংল্যান্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ফ্রান্স, জাপান, চিন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, মরিশাস, ইরাক, ইরান, মালয়, তিব্বত প্রভৃতি দেশের মানুষ। সভায় আটদিনে যে পনেরোটি অধিবেশন হয় তাতে বিদেশিদের মধ্যে যাঁরা সেই অধিবেশনগুলিতে সভাপতিত্ব করেন তাঁরা হলেন নানকিঙের ড. সি. এল. চেন (কলকাতার চিনা কনসাল জেনারেল), লন্ডনের স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড (চেয়ারম্যান, সোসাইটি ফর প্রোমোটিং দ্য স্টাডি

জন্মোৎসবে যোগদানকারী ভক্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল), সেখানে চিকাগো-উত্তরপর্বে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের দক্ষিণেশ্বরে আগমন (যে সংখ্যাটা পরবর্তীকালে বেলুড়ে অচিরেই লক্ষাধিকে পৌঁছে যায়) যে বিবেকানন্দের মতো মানুষকে আবেগের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দেবে তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। তাই জন্মোৎসবের খুঁটিনাটি আয়োজনের পরামর্শ থেকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে জগৎ-সংসারকে প্লাবিত করতে গুরুভাইদের উপদেশ দান—চিঠিগুলিতে উল্লেখ রয়েছে সবেরই।

বলাই বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সুতানুটির ভক্তমণ্ডলী তাঁদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টির জন্য যে উৎসবের সূচনা করেছিলেন তা এতদিনে যেমন সঙ্ঘবদ্ধরূপ পেল তেমনি বাংলার ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে তা ছড়িয়ে পড়ল বোম্বে (অধুনা মুম্বাই) এবং মাদ্রাজেও (অধুনা চেন্নাই)। যার বিবরণ শঙ্করীপ্রসাদ বসু'র সুবিখ্যাত *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে*-র দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কালে জন্ম-মহোৎসবে রূপান্তরিত হল। বিবেকানন্দের দেহাবসানের তিন দশকেরও বেশ কিছু সময় পরে এসে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সূচিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালনের একটা বৃত্ত যেন এতদিনে সম্পূর্ণ হল। এই বৃত্তের কিছু পরিচয় আবশ্যক।

যে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোৎসবের সূচনা হয়েছিল সেই সুরেন মিত্তির আনুমানিক ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় একটি অনন্যসাধারণ তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়েছিলেন, যাকে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব 'সুরেন্দ্রর পট' আখ্যা দিয়েছিলেন। চিত্রটি আজ বেশ প্রচারিত। তাতে দেখা যায় মন্দির (শৈবমন্দির), মসজিদ, গির্জা তিনটিরই অস্তিত্ব। ঘড়ির টাওয়ার শোভিত অ্যাংলিকান চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণদেব। মন্দির ও মসজিদের সামনে মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে প্রেমানন্দে দিব্যনৃত্য করছেন যিশুখ্রিস্ট ও চৈতন্যদেব। আর এঁদের ঘিরে রয়েছেন সর্বধর্মের মানুষ—যেমন রামানুজ সম্প্রদায়ের জনৈক বৈষ্ণবাচার্য, একজন তান্ত্রিকাচার্য, শিখ সম্প্রদায়ের নেতা, চার্চের পাদরি, কনফুসিয়াস ধর্মাবলম্বী চৈনিক, মুসলমান মৌলবি, জনাদশেক

অভেদানন্দ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতো মানুষেরা তো সভাপতিত্ব করেছিলেনই। বেনারসের মহারাজা স্যার আদিত্যনারায়ণ সিং, লিম্বডি'র মহারাজা, ময়ূরভঞ্জ, ত্রিবাঙ্কুর ও ভাবনগরের মহারাজারাও রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটিতে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন। এছাড়াও বিনয়কুমার সরকার, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসুর মতো মানুষেরা রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব আয়োজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন।

ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি মাত্র ৫৫ বছর আগে সুতানুটির মুষ্টিমেয় দু'তিনজন মানুষ যে উৎসবের সূচনা করেছিলেন সাড়ে পাঁচ দশকের মধ্যে তা নিখিল বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেল কোন মন্ত্রবলে? একটি মন্ত্র তো অবশ্যই বিবেকানন্দ। যাঁর চিকাগো-বক্তৃতা গোটা বিশ্বে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের ডালপালা ছড়ানোর কাজটা সহজতর করে দিয়েছিল। যে গৃহীভক্তেরা রামকৃষ্ণোৎসবের সূচনা করেছিলেন বিশেষ করে রামচন্দ্র দত্তের মতো মানুষ, তাঁদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ প্রচারের কৌশল নিয়ে বিবেকানন্দের বারে বারেই সংঘাত বেধেছিল। তিনি মনে করতেন ঠাকুরের নাম নয়, তাঁর আদর্শ প্রচার করলেই রামকৃষ্ণ-মহিমা জগৎ পরিব্যাপ্ত করবে। তাই শিকাগো-পূর্ব পর্যায়ে রামচন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথের এই জন্মোৎসব পালন তাঁকে কতটা আকৃষ্ট করতে পেরেছিল সন্দেহ, কিন্তু শিকাগো-উত্তরপর্বে এই উৎসবকে হাতিয়ার করে যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে সে উপলব্ধির কথা গুরুভাইদের লেখা বিভিন্ন পত্রে ব্যক্ত করেছেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর তাঁর নাম প্রচারকে কেন্দ্র করে গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালনের মধ্য দিয়ে যেন তারও অবসান হল। গৃহীদের দেখানো পথ ধরল ত্যাগীদের সাধনা। আর এই দুই মিলিত ধারার শক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁর ভাব-প্রচারের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

আর ঠিক এখানেই আমাদের বক্তব্য যে, এই সুতানুটি শুধু ভক্তের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখে ও জেনে তার কর্তব্য শেষ করেনি। ঐতিহাসিক অনিবার্যতার অনুষঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ তার কাছে ধরা দিয়েছিল। গিরিশের

অব্ রিলিজিয়নস্, ইংল্যান্ড), বুয়েন্স আয়ারসের মাদাম অ্যাডেলিনা ডেল ক্যারিল দ্য গুইরালদেস (আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আমেরিকা। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত লেখক সেনর গুইরালদেসের পত্নী ও ইনি নিজেও একজন কবি), প্যারাগুয়ের ড. ফ্রাঙ্ক ভেনসেসলাস তৌসেক (কলকাতার চেকোশ্লোভাকিয়ার কনসাল) ও ইরানের নাগরিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ আলি সিরাজি। এই মহাসভায় স্পেনীয়, জার্মানীয়, ইতালীয়, ফরাসি, তিব্বতি, সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, মায় আরবি ভাষাতেও প্রবন্ধ পাঠ হয়েছিল।

তথ্যগুলো এ-কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা কীভাবে বহির্জগতে প্রভাব ফেলছিল এ-সব তারই দলিল। ভারত ও পশ্চিমবাংলার সর্বত্র তো বটেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় নিউ ইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, বস্টন, ওয়াশিংটন, প্রভিডেন্স, বুয়েন্স আয়ার্স, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম, ওয়ারশ, সিডনি, টাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার, মোসাম্বা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল, জোহানেসবার্গ, রোডেশিয়া, টোকিয়ো, সাংহাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার প্রকাশিত *দ্য রিলিজিয়নস্ অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এর সম্যক পরিচয় পাঠক পাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে রামকৃষ্ণ জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির (ঠিকানা, ৫১, ল্যাঙ্কেস্টার গেট, ডব্লিউ-২) উদ্যোগে যে কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিবেকানন্দ-অনুরাগী ই.টি. স্টার্ডি। এ-খবর বেরোয় *বিচিত্রা* পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৪২)। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য যে জেনারেল কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার সদস্যদের দিকে চোখ বোলালে দেখা যাবে বিদেশের কত জ্ঞানী-গুণীজন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদেশের পাশাপাশি দেশি প্রাজ্ঞের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না এই মহোৎসবে। ধর্মমহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সরোজিনী নাইডু, কাকা কালেলকর, বস্টনের বেদান্ত সেন্টারের স্বামী পরমানন্দ, বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী

সুতানুটিবাসীকে যেমন আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারব, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা যাতে সর্বপ্রকার জাগতিক মোহ-মুক্তি ঘটিয়ে সুতানুটিবাসীর দ্বারে পৌঁছে যায়, আমাদের এই আশা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

এই গ্রন্থের দুটি পর্যায়। প্রথমত, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ধান-সদৃশে'। যাতে উনিশ শতকে জাত বিশিষ্ট বঙ্গ-মনীষীদের রচনা চয়ন করা হয়েছে। এই পর্বে মূলত শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ: ভাবনা-ভুবনে'। যাতে বিশ শতকে জন্মানো বাঙালিরা কলম ধরেছেন। এঁদের প্রত্যেকের লেখাই গবেষণা-প্রসূত। তিনটি সংযোজন অংশ-ই আকর্ষণীয়। যথাসময়ে তা আলোচিত হবে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংযোজনটি রাখা হয়েছে পাঠকের খোলামনে বিচারের জন্য। রচনাগুলি লেখকদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম হয়েছে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের লেখাটির ক্ষেত্রে, যাতে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি তিনি সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এই রচনাটি সহজবোধ্য কারণেই সর্বাগ্রে জায়গা পাওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয়েছে। এবার রচনাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বিষয়টি শেষ করব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবার্ষিকী থেকে সার্ধ-শতবার্ষিকী' প্রবন্ধটির কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসার্ধশতবর্ষের প্রেক্ষিতে লেখা এই প্রবন্ধে তাঁর জন্মশতবর্ষ সমারোহের কিছু উত্তাপ পাঠক অবশ্যই পাবেন। এবং আমাদের এই গ্রন্থ সংকলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গেও এই প্রবন্ধ অনেকাংশে মিলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে *প্রবাসী* পত্রিকায় দুটি, একটি শিবনাথ শাস্ত্রীর ও দ্বিতীয়টি কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রবন্ধ ছাপা হয়। আরেকটি ছাপা হয় *বিচিত্রা* পত্রিকা'য় অরবিন্দ অনুগামী নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা। এঁদের মধ্যে শিবনাথ ও কৃষ্ণকুমার—দুই ব্রাহ্মনেতাই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে জানতেন। তাঁদের রচনায় তা স্পষ্টও। কিন্তু নলিনীকান্তের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের আড়াই বছর পরে তাঁর জন্ম। তবে দার্শনিক-সুলভ তত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর লেখাটি সত্যিই অসামান্য।

পরীক্ষা, রামচন্দ্রের দুঃখ কিংবা কেশবচন্দ্রের ভক্তি—রামকৃষ্ণের গুরু হয়ে ওঠার কাহিনি একটি নয়, একাধিক। আমরাও ভক্তের ভক্তিরসকে আরও স্রোতস্বিনী করার বাসনায় এই গ্রন্থ-প্রণয়ন করিনি। সুতানুটির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষায় দায় আমাদেরও। সেই দায় মেটাতেই ইতিহাস পুরুষ হিসেবে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে চেয়েছি, যেখানে ভক্তি খুব গুরুত্ব পায়নি, পেয়েছে মানবমুক্তির বিষয়টি।

সবক'টি লেখাই সাময়িক-পত্র থেকে নেওয়া। একমাত্র ব্যতিক্রম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের লেখাটি। আমাদের সংকলিত অনেকগুলি লেখার সঙ্গেই সঙ্গত কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মানব-মুক্তির সন্ধানও যেহেতু এই সংকলন-গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য তাই সেদিকে তাকিয়েও কিছু প্রবন্ধ-চয়ন করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষের পর কেটে গিয়েছে আরও আটটি দশক। ইতোমধ্যেই সওয়া একশো, সার্ধশত, পৌনে দু'শো—জন্মবর্ষ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন মাইলস্টোন পেরিয়ে এসেছেন মাত্র পঞ্চাশেই ইহলীলা ত্যাগ করা শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কিন্তু সুতানুটির এই ঐতিহ্যগাথার স্বীকৃতির কোনো তাগিদ কেউ অনুভব করেননি। তাই তাঁর ১৮০তম জন্মবর্ষে আমরা আবার সুতানুটিবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সুতানুটির কয়েকটি মানুষের উদ্যোগে একদিন যে আলোকবর্তিকা তৈরি হয়েছিল আজ বিশ্বে তাই সূর্যালোকে পরিণত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম-প্রচার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই ইতিহাস পুরুষকে সুতানুটির মানুষের সামনে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গতার খাতিরেই তুলে ধরতে চেয়েছি আমরা, যাতে ইতিহাস-অবমাননার দায়ে আমাদের পড়তে না হয়। ঐতিহাসিকভাবে এও সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্থূলদেহে ভক্তমণ্ডলীর সাহায্যে কিংবা পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অসংখ্য-শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে যত না তার ভাববিস্তার করতে পেরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের মাধ্যমে তার থেকে অনেক বেশি রামকৃষ্ণ-ভাবধারা ছড়িয়ে যেতে পেরেছেন, গোটা বিশ্বেই। তাই তাঁর ১৮০তম জন্মবর্ষের ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা এমন একটি গ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছি যাতে তাঁর জন্ম-মহোৎসবের তাৎপর্য ও অতীত ঐতিহ্য

'আচার্য কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মগণই রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর অজ্ঞাত কক্ষ হতেই জনসমাজের নিকট আনয়ন করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'পরমহংস' উপাদান দান করিয়াছিলেন। (এ নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে— অ.না.) তৎপূর্বে লোকে তাঁহাকে কালীবাড়ির পুরোহিত বলিয়াই জানিত। ...পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীর ব্রাহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব দাসের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহুবার দেখিয়াছি। ''কত ভালবাস গো মা মানব-সন্তানে''—ব্রহ্মসঙ্গীতের এই গানটি তিনি এমন তদ্গত হইয়া গাহিতেন যে সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মকৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন 'ওঁ, ওঁ', বহুক্ষণ এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞা লাভ করিতেন। তাঁহার এই সমাধির অবস্থা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি ব্যাকুলচিত্তে ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন এবং প্রেমে উন্মত্ত হইতেন।'

(*কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত*, ১৯৩৭, পৃ. ১৫৫-১৫৬)

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (মূল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর ধর্মজীবনে বারংবার অস্থিরতা অনুভব করেছেন। সনাতন ধর্ম থেকে কেশব সেনের নববিধানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই হয়ে যান প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। পরক্ষণেই আবার রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য জীবনের শেষ পর্বে তিনি যে ধর্মে আশ্রয় পেয়েছিলেন তার নাম রামকৃষ্ণ-ধর্ম। এই পর্বে তিনি বেশ কিছু রামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত মনোজ্ঞ ও ভাব-ব্যঞ্জনায় অসামান্য রচনা প্রকাশ করেন। যেমন 'রামকৃষ্ণ কথা' (দ্র. *উদ্বোধন*, চৈত্র ১৩৩৫), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' (দ্র. *উদ্বোধন*, মাঘ, ১৩৩৫), 'নরদেবতা' (*স্বরাজ*, ফাল্গুন, ১৩১৪) এবং 'জন্মোৎসব' (*দৈনিক বসুমতী*, ২ ফাল্গুন, ১৩৫১)। এই রচনাগুলি সবই আমরা পুনর্মুদ্রিত সূত্র থেকে পেয়েছি। একমাত্র 'নরদেবতা' বাদে বাকি রচনাগুলি যে প্রথম অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রকাশের সন-তারিখেই স্পষ্ট। কারণ ততদিনে ব্রহ্মবান্ধব রামকৃষ্ণালোকে। এর মধ্যে 'জন্মোৎসব' রচনাটি আমাদের গ্রন্থনায় প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গৃহীত হল। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*-খ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। শতবর্ষের যাবতীয় খবরাখবর একনিষ্ঠভাবে প্রচার করে যাচ্ছিল তাঁর মাসিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা দুটি। এই প্রসঙ্গে *প্রবাসী*-র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তিনি কলম ধরা ছাড়াও এ-নিয়ে বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন *উদ্বোধনে* ('পরমহংস রামকৃষ্ণ', ফাল্গুন, ১৩৪২, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা) এবং ইংরেজিতে *মডার্ন রিভিউ*-য়ে ('Profession and Realization, and Path and no Path', April, 1937)। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী সভায় ৬ মার্চ বিকেলের অধিবেশনে পাঠ করেছিলেন। রামানন্দের রামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত বাংলা রচনাটি মূলত শিবনাথ শাস্ত্রী-কে আশ্রয় করে লেখা। শিবনাথের মূল লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল রামানন্দ সম্পাদিত *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় (পৃ. ৪৯০-৪৯৭), 'Men I have Seen' প্রবন্ধমালার অন্তর্গত হয়ে। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Personal Reminiscences of Ramakrishna Paramhansa'। পরবর্তীকালে এটি গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে ১৯১৮ সালে বেরোয় *প্রবাসী* প্রেস থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ওই প্রবন্ধটির ভাবানুবাদ করে তা *প্রবাসী*-তে ছাপান রামানন্দবাবু। অবশ্য অনুবাদক হিসেবে কোথাও তাঁর নাম না থাকলেও লিখন-শৈলী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী-কে আশ্রয় করে তাঁর বিরচিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণ'-র সঙ্গে এই আলোচ্য রচনাটিকে মিলিয়ে অনুবাদকের হদিশ পেতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। নিজের রামকৃষ্ণ-দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব যেভাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর দৃষ্টি দিয়ে দেখে পুষিয়ে নিতে চেয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক মহাশয়, তা যে অভিনব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনিই প্রবন্ধ চেয়ে থাকবেন *প্রবাসী*-তে ছাপাবার জন্য। কৃষ্ণকুমার তাঁর আত্মচরিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যা লিখেছেন তাকে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কৃষ্ণকুমার লিখেছেন :

'শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী ধর্মমহাসভা'য় দিয়েছিলেন এবং ভাষণ-পরবর্তী শব্দ ও বাক্যের সংযোজন চৌকো বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিতও করা হয়েছিল ওই প্রবন্ধে।

পরবর্তী সময়ে ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের পক্ষে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 'দ্য রিলিজিয়ানস্ অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতির অভিভাষণের যে কপি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কিন্তু *মডার্ন রিভিউ*-এ প্রকাশিত শব্দদ্বয় 'Woman and gold' (কামিনী ও কাঞ্চন) এবং 'Vamacharini' (বামাচারিণী)-এর প্রতিফলনই দেখা গিয়েছে। আমাদের সংকলনে এই শেষোক্ত পাঠটিই ব্যবহৃত হয়েছে। মহাসভার একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৭ সালের ১৩ মার্চ তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ছাত্রদের উদ্দেশে একটি ভাষণও দেন। যা মুদ্রিত হয় *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ওই বছরের মে সংখ্যায় 'Paramahansa Ramakrishna as Mystic' (পৃ. ৫০৪-৫০৬) শিরোনামে। প্রসঙ্গত, ব্রজেন্দ্রনাথ যদিও বয়সে নরেন্দ্রনাথ দত্তের চেয়ে বছর খানেকের ছোটো ছিলেন কিন্তু জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে তাঁর ওপরের ক্লাসে পড়তেন। রামকৃষ্ণদেবকে তিনি দর্শনও করেছিলেন।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কবি সরোজিনী নাইডু ১৯৩৭ সালের ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিক ধর্মমহাসভার বিকেলের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন, টাউন হলে। তাঁর সভাপতির অভিভাষণটি আমাদের সংকলনে মুদ্রিত হল। এছাড়াও ধর্ম-মহাসভার ৩ মার্চ বিকেলের অধিবেশনে তিনি 'রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক একটি ভাষণও দেন। সূত্রধরের কর্ণধার সুমন ভৌমিকের অনুরোধে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও সরোজিনী নাইডুর সভাপতির অভিভাষণ দুটির বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন মহেশ্বর ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনুবাদকর্ম বলে রচনা দুটি সংযোজন অংশে গ্রথিত হল।

ধর্মসমন্বয়ের বাণী জগতের অনেক মহাপুরুষই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি ধর্মমতকে যাচাই করে রামকৃষ্ণদেব তবে ঘোষণা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সভায় সভাপতির যে অভিভাষণটি দিয়েছিলেন তা-ই মুদ্রিত হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ' শিরোনামে। সুতরাং আমাদের এই সংকলনে রচনাটির গুরুত্ব বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসভায় টাউন হলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ বিকেলে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি অসুস্থ থাকায় অবশ্য পুরো সময়ের জন্য সভাপতিত্ব করতে পারেননি। তাঁর অনুরোধে বাকি সময় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভেদানন্দ। এমনকী ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তৃতাটিও তাঁর নির্দেশ-মতো সভাস্থলে তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র তা পাঠ করেন। তাঁর বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয় দুটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকায়। *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ১৯৩৭ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য শীলের ভাষণটির শিরোনাম ছিল 'Paramahansa Ramakrishna : Saint, Mystic and Seer' (পৃ. ৩৯৮-৪০২)। অন্যদিকে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এও এই অভিভাষণটি 'প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসেস' শিরোনামে মুদ্রিত হয় '৩৭-এর এপ্রিল সংখ্যায়। যদিও এই দুই ইংরেজি বয়ানে কিছু শব্দের অসামঞ্জস্য দেখা যায় যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার ওই বছরেরই মে সংখ্যায় (পৃ. ৬১৫)। যেমন *মডার্ন রিভিউ*-এ আচার্য শীলের ভাষণে 'Woman and gold' (কামিনী ও কাঞ্চন) কথাটি থাকলেও *প্রবুদ্ধ ভারতে* তা পরিণত হয়েছে 'Lust and gold' (কাম ও কাঞ্চন)-এ। আবার *মডার্ন রিভিউ*-এ যে 'যুবতী ও সুন্দরীর উদ্যোগে তন্ত্রসাধনায় তাঁর কোলে বসে কালীর ধ্যান করেছিলেন, রামকৃষ্ণ, তাঁকে 'বামাচারিণী' বলে অভিহিত করা হলেও *প্রবুদ্ধ ভারতে* তিনি 'ব্রহ্মচারিণী'-তে রূপান্তরিত হয়েছেন। *মডার্ন রিভিউ*-এর ওই মে সংখ্যায় এও দাবি করা হয় যে তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথের বয়ানটি 'অথরাইজড কপি' যেটা আচার্য শীলমহাশয় আদতে লিখেছিলেন ও ধর্মমহাসভায় পাঠ করিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এর এপ্রিলে আচার্য শীলের ভাষণটি *মডার্ন রিভিউ*-এ মুদ্রিত করার সময়ই বলা হয়েছিল এটি 'পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তিত' ভাষণ, যা তিনি

করেছিলেন 'যত মত, তত পথ।' তাঁর ধর্মসাধনা ভারতের সনাতন ধর্ম থেকে পৃথক ছিল না। কিন্তু আত্তীকরণের মহৎ গুণ ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সম্পর্কে একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছিলেন সৈয়দ মুজতবা সিরাজ---'ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ।' শুধু তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের মিলনের বাণীই দেননি তিনি। বরং ধর্ম সাধনার ত্রিবেণী সঙ্গমকে চোখ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বহুধাবিভক্ত, সম্প্রদায় কোন্দলে দীর্ণ হিন্দুধর্ম তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি ঋণী। ক'জন কালীসাধক বৈষ্ণব তীর্থে তীর্থে ঘুরতে পেরেছেন? ক'জন কালীপূজক বলেছেন, সাকার-নিরাকার দুই-ই সত্য? এই সার্বজনীন গ্রহিষ্ণুতা ও পরমত-সহিষ্ণুতাই শ্রীরামকৃষ্ণকে আর পাঁচজন ধর্মগুরু থেকে আলাদা করেছে। এই ভাবটিই সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী-র সময়। এবং এখনও অবধি এই ভাবই বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিষয়টি উপলব্ধির জন্য রেজাউল করীমের 'ধর্মসমন্বয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান' ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শন', প্রবন্ধ দুটি চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টিকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখেছেন সাংবাদিক-প্রবর সন্তোষকুমার ঘোষও 'ক্রুশে, ক্যান্সারে কোনও ভেদ নেই'।

সাকার-নিরাকার নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বিক সহিষ্ণু মতামত আমাদের জানা। আর তাঁর এই মতাদর্শ তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আরও নিকটে নিয়ে আসে। বন্ধন-সূত্র অবশ্যই ছিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন। ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবের নববিধান আসলে রামকৃষ্ণের ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গ যদিও বিতর্কিত। শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো ব্রাহ্মরা তাঁর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই সংকলন-ভুক্ত এঁদের লেখনীতেই তাঁর প্রমাণ রয়েছে। কেশব সেনের অকালপ্রয়াণ ও থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের দূরবর্তী করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে যথাযথ আলোকপাত করেছেন শ্রদ্ধেয় গবেষক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্ম আন্দোলন' প্রবন্ধে।

একথা অনস্বীকার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিল কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলিই। তাঁর পরিচালিত *The Indian Mirror*, *The Sunday Mirror*, *The New Dispensation*, *ধর্মতত্ত্ব*, *সুলভ সমাচার* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রামকৃষ্ণ-সমাচার প্রায় নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে সেই সময়ই। গবেষণার ক্ষেত্রে যা অমূল্য উপাদান হিসেবে এখন বিবেচিত হচ্ছে। বিষয়টি প্রথম খেয়াল করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। তাঁদের *সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস* (১৩৫৯ ব.) গ্রন্থটিতে এইসব পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত বহু সংবাদ রয়েছে। এঁদের দেখানো পথে হেঁটে গবেষক নির্মলকুমার রায় রচনা করেছেন 'পুরনো কলকাতার পত্রপত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি। প্রসঙ্গত, পত্রিকা-পরিচালক কেশবচন্দ্র সেন-কে জানতে গেলে দেখতে হবে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কেশবচন্দ্র সেন : পত্র-পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন' (*প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৬৪, পৃ. ৬৩৯-৬৪০) প্রবন্ধখানি।

এছাড়াও আরও যেসব পত্র-পত্রিকায় রামকৃষ্ণ-সংবাদ বেরিয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের গ্রন্থে এবং নির্মলবাবুর প্রবন্ধে যুগপৎ তা উল্লিখিত) সেগুলি হল *সখা* (প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৮৮৩, সম্পা. প্রমদাচরণ সেন), *ধর্মপ্রচারক* (প্রকাশ, ১২৮৪ ব., সম্পা. কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, উত্তরকালের কৃষ্ণানন্দ স্বামী), *বেদব্যাস* (প্রকাশ : ১২৯৩ ব., সম্পা. ভূধর চট্টোপাধ্যায়) ও *তত্ত্বমঞ্জরী* (প্রকাশ : ১৮০৭ শক, সম্পা. রামচন্দ্র দত্ত)। লক্ষণীয়, ব্রাহ্মসমাজের পত্র-পত্রিকাগুলির পাশাপাশি ধর্মপ্রচারক কিংবা বেদব্যাসের মতো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোঁড়া হিন্দু মুখপত্রেও রামকৃষ্ণ-সমাচারের আতিশয্য। তবে এইসব সাময়িকীগুলির অতি দুষ্প্রাপ্যতার জন্য রামকৃষ্ণদেবের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই আমাদের অগোচরে রয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, না অবতার, নাকি অবতার-বরিষ্ঠায়—এ-বিতর্ক মেটার নয়। কিন্তু সমাজের যে শ্রেণীর কাছে তিনি সত্যিই ভগবানের প্রতিভূ তাঁরা হলেন কলকাতার থিয়েটারের মানুষজন। উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ যাঁদের খুব সুনজরে দেখেনি। নটী তো বটেই,

নটেদেরও। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'মা'কে দেখেছেন সরু ফিনফিনে কাপড় পরা সন্ধেবেলায় 'বাবু' জোগাড় করতে চিৎপুরের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার মধ্যেও! কোনো ধর্মনেতা এমন কম্বুকণ্ঠে বলতে পেরেছেন : 'গিরিশ, থ্যাটার ছেড়ো না! ওতে লোকশিক্ষে হয়।' নইলে উনিশ শতকের এক 'বারাঙ্গনা' নারী, আচমকা একবিংশ শতকে এক 'বীরাঙ্গনা' নারী নটী বিনোদিনী-তে পরিণত হবেনই বা কেন? আজ একজন অভিনেত্রী-কে যে সম্মানের চোখে দেখা হয়, উনিশ শতকে অতি সুখস্বপ্নেও তা কল্পনা করা যেত না। সমাজের এই যে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন, তার মূলে রয়েছেন থিয়েটার-প্রেমী এক ধর্মীয় ও এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বিষয়টি নিয়ে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার' প্রবন্ধের তাই স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন কলকাতার সমাজের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে এ-নিয়ে প্রামাণিক পণ্ডিত (অথরিটি) নিশীথরঞ্জন রায়ের প্রবন্ধটি 'রামকৃষ্ণ-সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' আমাদের বড়ো ভরসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীগুলিকে আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্মগ্রন্থের অভিধা দিয়ে তার ব্যাপকতাকে সংকুচিত করে দেওয়ার প্রবণতা আমাদের নতুন নয়। এই সব জীবনীতে ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক প্রভাবের অনস্বীকার্য ভূমিকা উল্লেখ করেও বলতে হচ্ছে এর সাহিত্য-মূল্যও নেহাত কম নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা ছিল সহজ-সরল। হতে পারে তা প্রান্তিক, কিন্তু তা গদ্যময়ও। তাঁর উপমা ছিল কাব্যময়। ধর্মের কিংবা আধ্যাত্মিকতার জটিল তত্ত্ব, ততোধিক কঠিন ভাষায়, দুর্বোধ্য স্বরে ব্যাখ্যা করতেন না তিনি। তাঁর আধ্যাত্মিকতায় ছিল প্রাণ-প্রাচুর্য। তাই তাঁর বক্তব্য-ভিত্তিক জীবনীগুলি কিংবা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের রচনাগুলি সাহিত্যের মূলস্রোতে প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল বলেই 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে'র মতো সাহিত্য-গ্রন্থ আমরা উপহার পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষিকা চিত্রা দেবের দুটি প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যধারা ও বাংলাসাহিত্য' (*উদ্বোধন*, আশ্বিন, ১৩৯০) এবং অপরটি 'জীবনী

সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' (*উদ্বোধন*, আশ্বিন, ১৩৯২)। এর মধ্যে শেষেরটি আমাদের সংকলন-ভুক্ত হয়েছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবান রামকৃষ্ণ' (এই সংকলনে রয়েছে) প্রবন্ধটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি রামকৃষ্ণকে 'ভগবান' বলে মনে করেন, কি করেন না—সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু যে শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে তাঁর হিন্দুত্ব শিক্ষার হাতেখড়ি সেই শশধরকে জীবনের শেষপ্রান্তে একটি চিঠি লেখেন তিনি। চিঠিটি বেরোয় অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত *সারথি* পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩২৭)। তিনি *সারথি-তে* 'শ্রীপঞ্চশিখ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী বি.এ.' নামে লিখতেন। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন, বিদ্যাবিনোদ পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশে। চিঠিতে লেখা হয়েছিল :

> ''পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলাম— 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আপনার পরিচয় ও আলাপাদির বিবরণ' সংক্ষেপে আপনার মুখে বহুপূর্বে শুনিয়াছিলাম। শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িয়া দেখিতেছি, আপনার কথিত বিবরণের সহিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে বিবৃত ঘটনার প্রায়ই মিল নাই। সুতরাং এ বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ আমূল জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইতেছে। পরন্তু, রামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহাকে অবতার-স্বরূপ মনে করেন এবং সাধারণে তাঁহাকে 'পরমহংস' বলিয়াই জানেন। রামকৃষ্ণ সত্যসত্যই অবতার পদবী লাভ করিয়াছিলেন কিনা, সাধনার পথে তিনি কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং প্রকৃতই তাঁহার পরমহংস লাভ হইয়াছিল কিনা—জানিতে বড়োই ইচ্ছা হইতেছে। আপনি শাস্ত্রের যথার্থ মর্মজ্ঞ পণ্ডিত এবং রামকৃষ্ণের সমসাময়িক ও পরিচিত; তাই আশা হইতেছে, মহাশয়ের দ্বারা আমাদের এ সংশয় নিরাকৃত হইবে।''

এর প্রত্যুত্তরে শশধর তর্কচূড়ামণি যে পত্রখানি লেখেন তা *সারথি* পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই (ফাল্গুন ১৩২৭) উদ্ধৃত হয় 'চূড়ামণির পত্র' নামে। প্রায় সমসময়ে পত্রখানি প্রকাশিত হয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকা (পৌষ-মাঘ, ১৩২৭)-এ। এবার আর পাঁচকড়িবাবু নন। কলম ধরেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ স্বয়ং। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু নেতা ও উনিশ শতকের শেষপাদে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ,

কথোপকথন বিষয়ে 'কথামৃত' ইত্যাদি সূত্রে যা জানা ছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায় 'চূড়ামণির পত্র'-এ। *সারথি* কিংবা *সাহিত্য* আগে যে সংখ্যাটিই প্রকাশিত হোক না কেন, বিতর্কের ঝড় ওঠে *সাহিত্যের* পাতায়। শুধু 'চূড়ামণির পত্র'টি ছাপিয়েই ক্ষান্ত হননি পদ্মনাথ, নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ এর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেদিক দিয়ে *সারথি*-তে প্রকাশিত পত্রটির তুলনায় এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিবাদে *সাহিত্য* পত্রিকায় লেখেন 'বিবেকানন্দ-চরিত'-এর লেখক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'র লেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যুত্তরে ফের কলম ধরেন পদ্মনাথ। এবার (দ্র. *সাহিত্য*, মাঘ, ১৩২৮) তিনি এ-নিয়ে শশধর তর্কচূড়ামণির আরও দুটি পত্র ছাপিয়ে দেন। এই বাদ-বিসংবাদ প্রতিবাদটি আমরা এক মলাটের মধ্যে নিয়ে এলাম প্রথমবারের জন্য। মাঝে অবশ্য 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ' (*সাহিত্য*, পৌষ ১৩২৮ ব.) শিরোনামে একটি লেখায় *সাহিত্য*-য় প্রকাশিত তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত লেখাগুলির সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেন পদ্মনাথ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা সেভাবে না থাকায় এটি সংকলন-ভুক্ত হল না। প্রবন্ধগুলির প্রুফে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ছিল। তার সংশোধনী বেরোয় *সাহিত্যের* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় (পৃ. ৮৮৮)। আমরা সেগুলি শুধরে নিয়েছি। পদ্মনাথ শশধর তর্কচূড়ামণির পত্রগুলি ও নিজস্ব রচনাগুলিকে নিয়ে এ-সংক্রান্ত একটি বই বের করেন—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' (বারাণসী, ১৮৪৬ শক)। কিন্তু সেখানে শুধুই একতরফা পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদেরই বয়ান। সাহিত্যের তাপ-উত্তাপ এতে অনুপস্থিত। *বিভাব* বিশেষ যুগ্ম সংখ্যায় (১৩৮৩, পৃ. ৬৪-৭৫) অলোক রায়ের রচনা-পরিচয় সহ *সারথি*-তে প্রকাশিত 'চূড়ামণির পত্র'টি পুনর্মুদ্রিত হয়। তা পুনরায় পুনর্মুদ্রিত হয় *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*-র শারদ, ১৪১৮ সংখ্যায় (পৃ. ১৭১-১৮০)। সেই দিক দিয়ে আমাদের সংকলনভুক্ত (দ্রষ্টব্য: সংযোজন - ২) এই বিষয়টি অভিনব ও চমকপ্রদও। পাঠকের সুবিধার্থে শশধর তর্কচূড়ামণির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক পরিচিতির সংযোজন অংশে মুদ্রিত হল।

বিশিষ্ট বঙ্কিম-গবেষক গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র (জীবন ও সাহিত্য)' গ্রন্থে সংযোজন অংশে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে একটি রচনায় বিতর্কের ঝড় তোলেন। তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতের প্রচলিত ধারণায় কুঠারাঘাত করে প্রশ্ন তোলেন :

> 'বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে আসছে। চলতে চলতে এখন এমন হয়েছে যে এটা প্রায় প্রবাদ হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে হল এই—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হলে রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—মানুষের কর্তব্য কি? উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। এই উত্তর শুনে রামকৃষ্ণ ঘৃণায় বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব তিরস্কার করেছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ পর্যন্ত কেউই এই কাহিনিটির উৎস অনুসন্ধান তো করেনইনি, এমনকী এর সত্যাসত্য নিয়েও যাচাই করেননি। এই কাহিনিটি সম্বন্ধে অনেক দিন থেকেই আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ বলা তো দূরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন দেখাই হয়েছিল কিনা সন্দেহ। (*বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য*, গোপালচন্দ্র রায়, দে'জ ১৯৮১ গ্রন্থভুক্ত সংযোজন অংশ, শিরোনাম: 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৩৮)।

এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বহু-মানিত সন্ন্যাসী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। *উদ্বোধনে* (কার্তিক, ১৩৯৪) তিনি এ-নিয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন গোপালচন্দ্র রায়কে, তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম' প্রবন্ধে। পাল্টা এ-নিয়ে মুখ খোলেন গোপালবাবুও তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম' নামক গ্রন্থে (প্রকাশক: নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, ১৯৮৮)। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়েই নীরবতা অবলম্বন করলাম। পাঠকদের কাছে একটাই অনুরোধ, রামকৃষ্ণের সার্বজনীন উদারতাকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংকলনভুক্ত শুধু স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের প্রবন্ধটিই (সংযোজন-৩) পাঠ করবেন না, গোপালচন্দ্র রায়ের এ-সংক্রান্ত লেখনীর সঙ্গেও পরিচিত হবেন। আমরা হিরণ্ময়ানন্দের লেখাটি চয়ন করেছি এই আশা ও ভরসায় যে সত্য যতই নির্মম হোক তা স্বীকার করে নেওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোনো প্রবঞ্চনা যেন সেই সত্য-নির্ণয়ের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে সত্য কিন্তু মিথ্যায় পর্যবসিত হবে।

সবশেষে পূর্ণচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব সংক্রান্ত যে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে এই গ্রন্থনা-র সূচনা সেই সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলে বিষয়টি শেষ করব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে রামকৃষ্ণদেবের তিনটি কোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। একটি ঠাকুরের অসুখের সময় তৈরি হওয়া অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠী। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৭৯ খ্রি.) ৩ কার্তিক প্রস্তুত ওই কোষ্ঠীতে রামকৃষ্ণদেবের জন্মসাল ও জন্মদিন হিসেবে যথাক্রমে ১৭৫৬ শকাব্দ ও ১০ ফাল্গুন উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। অপর একটি কোষ্ঠী যা ১৩০০ বঙ্গাব্দে ক্ষেত্রনাথ ভট্ট গণনা করেছিলেন সেই হিসেবে ঠাকুরের জন্মসাল ও জন্মদিন দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৫৪ শকাব্দ ও ১০ ফাল্গুন। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি। অন্যদিকে নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ বেলুড় মঠে ঠাকুরের যে নতুন কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন তাতে ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ ফাল্গুন (১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি)-কে ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। এদিকে 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতকালে স্বয়ং ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেন যে তাঁর যথার্থ জন্মপত্রিকা হারিয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করানো হয়েছে তা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ একথাও বলেছিলেন যে, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে বুধবারে তাঁর জন্ম। *কথামৃতে* তাঁকে গিরিশচন্দ্র প্রমুখের কাছে বলতে শোনা যায় যে দ্বিতীয়ার চাঁদে তাঁর জন্ম। আর জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ ছিল। তিনি কুম্ভরাশির জাতক ছিলেন।

এই সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে সারদানন্দ অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠীটি বাতিল করেন। কারণ ১৭৫৬ শকাব্দের ১০ ফাল্গুন ছিল শুক্রবার ও কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের কথামতো শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে ও বুধবারে জন্মের হিসেব মেলে না। এই হিসেবে ১৭৫৪ ও ১৭৫৭ শকাব্দের দিনপঞ্জিতে একটি করে দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া ছিল বুধবার ও কুম্ভরাশিতে রবি, চন্দ্র, বুধ একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ভক্তমণ্ডলীর

কাছে নিজ বয়সের কথা ঠাকুর যা বলেছিলেন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সূত্র থেকে সহজেই অনুমিত হয় মাত্র অর্ধশতাব্দী কাল ছিল তাঁর ইহজীবনের আয়ু। এই হিসেবে ১৭৫৪ শকাব্দের পরিবর্তে ১৭৫৭ শকাব্দ-ই তাঁর জন্মসাল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই সূত্র ধরে নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকোষ্ঠী গণনা করে ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ ফাল্গুন তাঁর জন্মতিথি নির্ধারণ করেন। সেক্ষেত্রে বাংলা দিনপঞ্জি অনুযায়ী ১২৪২ বঙ্গাব্দ ও ইংরেজি ক্যালন্ডারের মতে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ৬ ফাল্গুন ভোর রাতে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ রাত বারোটাতেই ১৭ ফেব্রুয়ারি দিবসাবসান হয়েছে, ১৮ ফেব্রুয়ারির সূচনা হয়েছে। সেদিক দিয়ে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি-ই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস হিসেবে সবচেয়ে প্রামাণিক তথ্য। কিন্তু কখনও কখনও ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারিকেও রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। স্বয়ং স্বামীজি-ই এক জায়গায় তাঁর জন্মদিন ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্ণচন্দ্রও এই একই কাজ করেছেন।

তাঁর জন্মের মতোই রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণটিও সময়ের নিরিখে দিনের গণ্ডগোলে পড়েছে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ রাত্রি ১টা নাগাদ তাঁর মহাসমাধি হয়। ১৯ অগাস্ট *দ্য ইন্ডিয়ান মিরবে* খবর বেরোয় : 'The much respected Ramakrishna Paramahansa of Dakhineswar who was ailing for some months past from scrofula, breathed his last at about 1 a.m. on Sunday, the 15th instant.' রাত বারোটার পরে একটা নাগাদ রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে তখন ১৫ অগাস্টের দিবসাবসান হয়েছে। ১৬ আগস্ট দিনের শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলা দিনপঞ্জিতে তখনও ৩১ শ্রাবণ চলছে, ১ ভাদ্রের সূচনা হয়নি। তাই ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ বাংলা দিনপঞ্জি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি হলেও, ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নিরিখে কিন্তু ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবস। তবে ঠিক কোন সময় তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন? সময়ের হেরফেরের সামান্য মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন রামচন্দ্র দত্ত দেরিতে অকুস্থলে পৌঁছেও ঠাকুরের মহাসমাধির সময় নির্ধারণ করেছেন

রাত ১টা ৬ মিনিট। যদিও এই মত স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু রামকৃষ্ণের সেবক শশীভূষণ চক্রবর্তীর হিসেবে রাত ১টা ২ মিনিটে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ। ভক্ত *মনোমোহন* গ্রন্থের হিসেব বলছে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ রাত ১টা ৪ মিনিটে। প্রসঙ্গত, পরের দিনের *ধর্মতত্ত্ব* পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার সময় ভুলবশত রাত্রি দশটা বলে উল্লিখিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮০তম জন্মবর্ষকে সামনে রেখে চারদিনের একটি উৎসবের পরিকল্পনা ও সেই উপলক্ষে একটি গ্রন্থ প্রকাশের চিন্তা সূত্রধর-এর কর্ণধার সম্পাদক সুমন ভৌমিকের মাথাতেই প্রথম আসে। এই সংকলনের কিছু রচনাও তাঁর সংগ্রহ করা। গ্রন্থটি প্রকাশের মুহূর্তে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞভাজন হয়ে রইলেন গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলে।

১ বৈশাখ, ১৪২২ — অর্ণব নাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ : সন্ধান-সদৃশে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর

আবির্ভাব — শকাব্দ ১৭৫৭,
বঙ্গাব্দ ১২৪২, ৬ ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া,
পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্র, কুম্ভরাশি, কুম্ভলগ্ন, সিদ্ধিযোগ,
বালব-করণ
খৃষ্টাব্দ ১৮৩৬, ১৭ ফেব্রুয়ারী।

তিরোভাব — শকাব্দ ১৮০৮
বঙ্গাব্দ ১২৯৩, ৩১ শ্রাবণ, রবিবার, পূর্ণিমা।
খৃষ্টাব্দ ১৮৮৬, ১৫ আগষ্ট (রাত্রি ২।।০টা হইতে ৩টার
মধ্যে ; অতএব ইংরাজী মতে ১৬ই আগষ্ট)

শাকে বারেষুবাজিক্ষিতিপরিগণিতে ফাল্গুনে শক্রমানে
দেবঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ কলসবিলগনে কুম্ভরাশৌ বুধাহে।
শুক্লায়াং ব্রহ্মতিথ্যাং সমজনি ভুবনেঽজৈকপাভে চ নাকং
যাত শাকেঽষ্টশূন্যাহিশশিযুজি রবৌ শ্রাবণেঽজ্যাগ্নিমানে॥

উৎস : *বিশ্ববাণী*, চৈত্র, ১৩৪৫।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

কৃষ্ণকুমার মিত্র

১৮৭১ সনে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নাম শুনি নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে পরমহংসদেবের নাম শুনিতে পাই।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলিকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সে বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। প্রতি সপ্তাহে তখন ব্রহ্মোপাসনা এবং বৎসরান্তে একবার ব্রহ্মোৎসব হইত। ব্রহ্মোৎসবের সময় বহু লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। আমিও একবার নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানেই সর্ব্বপ্রথমে পরমহংসদেবকে দর্শন করি।

তিনি নেপালবাবু ও গোপালবাবুকে বড় ভালবাসিতেন এবং মাঝে মাঝে ব্রহ্মোপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন। ব্রহ্মোপাসনার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে ‘‘কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে, মনে হ’লে প্রেমধারা ঝরে দুনয়নে” এই গান আরম্ভ হইয়াছিল। ‘‘কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে” শুনিবা মাত্র পরমহংসদেব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন কিন্তু ঐ গানের প্রথম ছত্র শুনিবামাত্র তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

তাঁহার ভাগিনেয় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাহার কর্ণে চীৎকার করিয়া ‘‘ওঁ, ওঁ,” ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব বহু-ক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন ‘‘আমাকে

ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাদের উপাসনায় বিঘ্ন করিয়াছি।" তাঁহার এই ভাবাবেশ দেখিয়া আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

ইহার পর এক দিন তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)। কি গান তাহা আমার মনে নাই। সেদিনও গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয়। তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার কর্ণে পুনঃ পুনঃ ওঁ ধ্বনি করাতে তিনি উঠিয়া বসেন।

তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইকপাড়ার নিকটবর্ত্তী সিঁথির এক উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল। রাধাবাজারে তাঁহার এক দোকান ছিল। প্রতি বৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত।

উপাসনা হইতেছে, কে উপাসনা করিতেছিলেন তাহা মনে নাই। পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁহাকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। অন্যান্য স্থানে যেমন, তেমন এখানেও উপাসনার সময়ে অচেতন হইতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরিভোজনের আয়োজন হইত। পরমহংসদেব নানা গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অনেকের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী খাইতে পারিতেন। আহারান্তে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, "মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" এই কথাটা এখনও আমার মনে আছে। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমার মনে নাই।

উৎস : *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩৪২।

পরমহংস রামকৃষ্ণ

শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহার সমগ্র বাংলা অনুবাদ করিলে তাহা ছাপিতে 'প্রবাসী'র ন্যূনকল্পে দশ পৃষ্ঠা লাগিবে। এখন সমগ্র অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারা গেল না। পরমহংসদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের কেবল কয়েকটি অংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।]

"পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা আমার মনে আছে।... দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এক হাতে কিছু ধুলা ও অন্য হাতে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া তিনি নদীর ধারে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, এবং উভয়েরই সমান অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার পর তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, 'টাকা ধুলা, ধুলা টাকা, টাকা ধুলা, ধুলা টাকা', এবং এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবার পর ধুলা ও টাকা দুই-ই নদীতে ফেলিয়া দিতেন।"

"একজন সাধু তাঁহাকে দীনতা সাধন করিতে, আপনাকে হীনতম মেথরের সমান মনে করিতে, বলেন। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মেথরের কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি গোপনে এক প্রতিবেশীর পায়খানার নীচের দরজা দিয়া ঢুকিয়া ময়লার গামলা হইতে ময়লা ফেলিয়া দিয়া তাহা নদীতে ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। কিছু দিন তিনি এইরূপ করিবার পর ব্যাপারটি জানা পড়িল, এবং তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও অনুযোগ হইল। তখন তাঁহাকে মেথরের কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল।"

"বস্তুতঃ তাঁহার সহিত মিলামিশায় আমার মনে এই ধারণা জন্মে, যে, আমি ক্বচিৎ এমন আর একটি মানুষকে দেখিয়াছি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এত অধিক এবং যিনি ধর্ম্ম সাধনের জন্য এত দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি এখন আর সাধক নহেন কিন্তু সিদ্ধ হইয়াছেন। যে সত্যটির তিনি আত্মিক সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে তিনি স্বীয় আত্মায় মহৎ প্রেরণা লাভ করিতেন, তাহা পরমাত্মায় মাতৃত্ব। তিনি পরমদেবতাকে মা বলিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসিতেন, ঐশী মাতৃত্বের চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবাবেশ হইত, এবং বিশ্বজননীর বাৎসল্যের গান গাহিতে গাহিতে উত্তেজনার আধিক্যে তিনি সংজ্ঞাহারা হইতেন। তাঁহার এই বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা কোন বিগ্রহ বা মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের ধারণায় পরিণত হইত।"

"ভবানীপুরের একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারক আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারে আমার সঙ্গী ছিলেন। এই বন্ধুকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি বলিলাম, 'আজ একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারককে আপনার নিকট এনেছি। তিনি আমার কাছ থেকে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে খুব ব্যগ্র ছিলেন।' রামকৃষ্ণ তখন মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমি যীশুর পায়ে বার বার প্রণাম করছি।' তাহার পর এইরূপ কথোপকথন হইল :

আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি যীশুর পায়ে প্রণত হচ্ছেন এ কেমন কথা? আপনি তাঁকে কি মনে করেন?

রামকৃষ্ণ—কেন আমি তাঁকে ঈশ্বরের একজন অবতার মনে করি।

আমার বন্ধু—ঈশ্বরের অবতার! আপনি কি দয়া ক'রে বলবেন আপনার কথার অর্থ কি?

রামকৃষ্ণ—আমাদের রাম বা কৃষ্ণের মত একজন অবতার। আপনি কি জানেন না, যে, ভাগবতে একটি উক্তি আছে, যে, বিষ্ণু বা পরব্রহ্মের অবতার অসংখ্য?

আমার বন্ধু—আপনি দয়া ক'রে আরও ব্যাখ্যা করুন; আপনার কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ—সমুদ্রের কথা ধর না। মহাসাগর বিশাল ও প্রায় অপার জলরাশি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে, মহাসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে, জল জমে বরফ হয়ে যায়। যখন তা জমে বরফ হয়, তখন তা সহজে নাড়া-চাড়া করা এবং বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবহার করা যায়। অবতার কতকটা তার মত। যেমন মহাসমুদ্র, তেমনি আছেন জড়ের ও চেতনের মধ্যে অনন্ত শক্তি; কিন্তু কোন কোন উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ঐ অনন্ত শক্তির এক একটি অংশ যেন ইতিহাসে মূর্ত্তিমান হন। তাঁকে তোমরা বল মহাপুরুষ, মহামানব। কিন্তু তিনি ঠিক্ বলিতে গেলে সর্ব্বব্যাপী ঐশীশক্তির স্থানীয় প্রকাশ, অর্থাৎ কিনা ভগবানের এক অবতার। মহাপুরুষদের মহত্ত্ব সারতঃ ঐশীশক্তির প্রকাশ।

আমার বন্ধু—আপনার মত বুঝলাম, যদিও আমরা তাতে সম্পূর্ণ সায় দি না। (তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু বলিলেন) আমার ব্রাহ্ম বন্ধুরা এ-বিষয়ে কি বলেন জানতে চাই।

রামকৃষ্ণ—(ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া) ও আহাম্মকদের কথা বলবেন না, এ-সব জিনিষ দেখবার চোখ তাদের নাই।

আমি—(রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া) আপনাকে কে বলেছে, মশায়, যে, মানবসমাজের বড় বড় উপদেষ্টাদের মহত্ত্ব ঐশীশক্তির প্রকাশ ব'লে আমরা বিশ্বাস করি না, এবং সেই অর্থে তাঁহাদিগকে ঐশ কোন ভাবের ("idea"র) অবতার মনে করি না? *

রামকৃষ্ণ—তোমরা কি সত্যি তাই ব'লে বিশ্বাস কর? আমি তা জানতাম না।"

"একবার একজন দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী লিঙ্গ অনুসারে জ্ঞান

---

* শাস্ত্রী-মহাশয়ের ব্যবহৃত ইংরেজী কথাগুলির অবিকল অনুবাদ করা গেল না বলিয়া মূল ইংরেজী দিতেছি :

"Myself—(addressing Ramakrishna) Who told you, Sir, that we do not believe that the greatness of the great teachers of humanity was a Divine communication, and in that sense they were incarnations of a Divine Idea?"

ও ভক্তি শব্দ-দুটির মধ্যে জ্ঞানকে পুরুষ ও ভক্তিকে নারী বলিয়া উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে জ্ঞান ক্লীবলিঙ্গ। যাহা হউক, এক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানানুযায়ী লিঙ্গভেদের চমৎকার প্রয়োগ তিনি করিলেন। একটিকে পুরুষ ও অন্যটিকে নারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া এবং নারীদিগের অন্তঃপুরে থাকিবার ভারতীয় প্রথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন :—'জ্ঞান পুরুষ ব'লে মা'র বাড়ির বাইরের মহলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ভক্তি নারী ব'লে একেবারে সোজা মা'র অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।'

আর একদিন একজন দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা সংসারে নিত্য নানা উদ্বেগ ও কর্ত্তব্য নিয়ে থাকি; এ অবস্থায় পারমার্থিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হ'লে কি করতে হবে?' রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ঢেঁকিতে মেয়েদের চিঁড়া তৈরি করতে দেখেছ? ঢেঁকির মুশল যে গর্ত্তটিতে ক্রমাগত পড়ে ও তার থেকে ওঠে, তার কাছে একটি স্ত্রীলোক ব'সে থেকে তাতে ধান দেয় আর কুটা ধানগুলি সরিয়ে নেয়। তাকে গর্ত্তটি থেকে কুটা ধান খুব সাবধানে সরাতে নয়, নইলে তার আঙ্গুলগুলি থেঁতলে যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটির কথা ভাব। আর এও বিবেচনা কর যে, সে তখন অন্য কাজেও ব্যাপৃত থাকে। তার কোলে একটি শিশু আছে, তাকে সে মাই দিচ্ছে, বাঁ হাত দিয়ে কুটা ধান রোদে দিবার জন্যে ছড়াচ্ছে, আবার একজন প্রতিবেশীকে কিছুক্ষণ আগে যে চিঁড়া দিয়েছিল তার সঙ্গে তার দামের কথাও বলছে। ঐ স্ত্রীলোকটির মন সকলের আগে সকলের চেয়ে বেশী কিসে আছে মনে কর? নিশ্চয়ই সেই ঢেঁকির গর্ত্তে ঢুকান হাতটিতে, যাতে ক'রে মুশলে হাতটা থেঁতলে না যায়। সেই রকম তোমরা এই সংসারে নানা ব্যাপারে লিপ্ত থেকো, নানা কর্ত্তব্যে ব্যস্ত থেকো, কিন্তু সকলের আগে সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়ে, যাতে তা নষ্ট না হয়।'

''আর একবার কথা উঠে? মালা জপ করা বা ঠাকুর দেবতার নাম বার বার উচ্চারণ করার বিষয়ে। সিদ্ধ সাধুপুরুষ বলিলেন, একটি নাম বার-বার আওড়ান কিছুই নয় যদি তার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ভাবের উদ্রেক না হয়। একটা টিয়াপাখীর দৃষ্টান্ত নাও। তার মালিক তাকে নিজের

দেবতাদের নাম শিখিয়েছে। তাই সে দিন নাই ক্ষণ নাই সকাল-সন্ধ্যা কেবলই রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ ব'লে চলেছে—যেন সে তাঁদের প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু একদিন একটা ধূর্ত্ত বেরাল পেছন থেকে এসে তাকে ধরল ও মেরে ফেলবার চেষ্টা করল। তখন কি শুন্‌তে পেলে? তখন তার কণ্ঠ থেকে আর রাধাকৃষ্ণ বেরয় না; তার জায়গায় তার যন্ত্রণার স্বাভাবিক ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ বেরতে থাকে। এইরকম, তোমাদের জপওয়ালা মানুষ প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় হয়ত আওড়ান নামটি ভুলে যায়; তোমাদের ভগবৎপ্রেমিক তার ভগবানের নাম ভুলে যায়; তার মামুলি অবিশ্বাস এসে পড়ে, ভগবানের চরণে তার যে আত্মসমর্পণ নাই তা ধরা পড়ে। যে ভগবদ্‌বিশ্বাস জীবনের নানা পরীক্ষায় টিকে থাকতে না পারে, তা বিশ্বাসই নয়।"

"একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্ন করিলেন, যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষের গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতার পরিচালন ও উপদেশের আবশ্যক কিনা। রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যদি কেউ তার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য পরিচালক পায়, তা হ'লে তা নিশ্চয়ই সুবিধাজনক ও মহা সৌভাগ্য; এরূপ লোক তাকে বিশেষ সাহায্য করবেন। সে যে স্বচেষ্টায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে না এমন নয়, কিন্তু এরূপ লোকের সংসর্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিকতর সহজে হয়।' তাহার পর নদীবক্ষে তখন যে ষ্টীমারটি বাইতেছিল তাহা দেখাইয়া সুধাইলেন, 'ঐ ষ্টীমারটা কখন্ চুঁচুড়া পৌঁছবে মনে কর?' প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, 'সন্ধ্যার আগে ৫টা ৬টার সময়।' রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ষ্টীমারের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা নৌকা দেখছ। ষ্টীমারটার সাহায্যে নৌকাটাও ঐ সময়ে চুঁচুড়া পৌঁছবে। কিন্তু ধর, নৌকাটাকে ষ্টীমার থকে খুলে নেওয়া হ'ল এবং ষ্টীমারটার সাহায্য না নিয়ে যেতে হবে; তা হ'লে সেটা কখন্ চুঁচুড়া পৌঁছবে?' লোকটি বলিলেন, 'সম্ভবতঃ কাল প্রাতঃকালের আগে নয়।' তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ঠিক্ সেই রকম, মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তার দুর্ব্বলতা ও ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে বিনা সাহায্যে অগ্রসর হ'তে পারে—এতে কেবল বেশী সময় লাগে

মাত্র; অন্য দিকে, যদি সে কোন অগ্রসর আত্মার সঙ্গ ও সাহায্যে সুবিধা পায়, তা হ'লে সে দশ-বার ঘণ্টার পথ চার ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারে'।"

"থাক্, তাঁহার উপদেশের কথা অনেক বলিলাম। এখন তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ আমার প্রতি কিরূপ ছিল, তাহা কিছু বলি। এক সময় তিনি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে বার-বার অনুরোধ পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিতেছিলাম না; তখন তিনি একদিন স্বয়ং আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হয়ত অন্য কোথাও কোন কাজে যাইবার পথে। তখন আমাদের মধ্যে এই কথাবার্ত্তা হইল—

"রামকৃষ্ণ—আমি বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এবং তুমিও বার-বার আসবে বলা সত্ত্বেও তুমি অনেক দিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই, এ কেমন কথা?

"আমি—ব্রাহ্মসমাজের কাজে আটক পড়ে গিয়েছিলাম। আজকাল আমি বড় ব্যস্ত।

"রামকৃষ্ণ—চুলোয় যাক্ তোমার ব্রাহ্মসমাজ যদি তা তোমাকে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে!

"তারপর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি হাসিলেন ও বলিলেন—'আমি যখন তোমার কাছে আসছিলাম' তখন লোকগুলো (অর্থাৎ তাঁহার নূতন শিষ্যেরা) বললে, 'আপনি একটা ব্রাহ্মের কাছে কেন যাবেন, সে আপনার দর্শন পাবার যোগ্য নয়।' 'তাতে আমি তাদের কি বলেছিলাম জান?'

"আমি—আপনি তাদের কি বলেছিলেন?

"রামকৃষ্ণ—আমি তাদের বললাম, দ্যাখ, আমি সব্বাইকার জন্যে।"

"আর একবার তিনি দম্‌দমার এক বাগান-বাড়ীতে একটি ব্রাহ্ম উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমার সেখানে যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। পৌঁছিয়া দেখি, তিনি ভিড়ের মধ্যে

দাঁড়াইয়া গান করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন, 'আঃ এখন আমার বুকটা জুড়াল।' তাহার পর তাঁহার সঙ্গীতাদি অসাধারণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

''একদিন আমি দীর্ঘকাল পরে যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখন দেখি এই সাধুপুরুষ তাঁহার সরল বালকোপম ভাবে তীর-ধনুক হাতে নিকটের গাছগুলার থেকে কতকগুলা কাক তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। বলিলাম, 'কি হচ্ছে? তীরন্দাজ হয়েছেন?' তাহাতে তিনিও আমাকে এত দিন পরে আসিতে দেখিয়া সমান বিস্মিত হইলেন ও তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল, যে, তিনি ভাবাবেগের আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে তাঁহার কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলাম, বিছানায় শুয়াইলাম, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান হইল ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যখন তিনি আবার কথা কহিতে পারিলেন তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে আলিপুরের 'চিড়িয়াখানায়' যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য তাঁহাকে সিংহ দেখাইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি সিংহগুলা দেখিতে পাইবার চিন্তায় আনন্দ যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সরলতা অতি মধুর। তিনি বার-বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'তুমি কি সিংহগুলিকে দেখতে ভালবাস না? মা-দুর্গার বাহন সিংহগুলিকে?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আমি অনেকবার তাদেরকে দেখেছি।' তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'তাদেরকে আর একবার দেখতে আমার সঙ্গে যাওয়া খুব মজা নয় কি?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, নিশ্চয়ই খুব মজা; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে আর একটা কাজে যেতে হবে। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে সুকিয়াস ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত যাব; তারপর নরেনকে তার ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠাব, সে আপনাকে সঙ্গে ক'রে জু'তে নিয়ে যাবে।' পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশ্যনে কাজ করিতেন।

"শেষে সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল, এবং একজন যুবা শিষ্য একখানা ছেকড়া গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। আমার যতদূর মনে পড়িতেছে, তিনিও গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া রামকৃষ্ণ আমার বামদিকে বসিবার জিদ ধরিলেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যখন গাড়ীটা চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি চাদর দিয়া বাঙালী নববধূদের মত মাথায় ঘোম্‌টা দিলেন। আমি তাঁহাকে সেরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'দেখছ না, আমি এখন বৌ হয়েছি; আমার বরের সঙ্গে যাচ্ছি।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাত দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উপবিষ্ট অবস্থাতেই আনন্দে নৃত্যের ভঙ্গী করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তখন যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল অসামান্য আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহারা হইবার পূর্ব্বে তিনি আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা, ওমা, আমাকে সংজ্ঞাহীন কোরো না মা। ওমা, আমি চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে যাচ্ছি। ওমা, আমি গাড়ী থেকে পড়ে যেতে পারি। এই যাওয়া-আসাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে বেশ ভাল থাকতে দাও।' অতঃপর তিনি আমার বাহুতে ভর দিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি আবার তাঁহার বালকোপম সরল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের মোড় পৌঁছিবার পর নরেনকে ডাকা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবকে জূ'তে লইয়া গেলেন। এখানে বলা দরকার, যে, মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন তখন সুকিয়াস ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল।"

[শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের শেষ তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।]

"My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me. I owe him a debt of gratitude for the sincere affection he bore towards me. He was certainly one of the most remarkable personalities I have come across in life."

তাৎপর্য্য। "তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্পকালস্থায়ী হইলেও, তাহা এই ফল দান করিয়াছিল, যে, তাহা আমার অনেক আধ্যাত্মিক

চিন্তাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি আমার প্রতি যে অকপট স্নেহ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী। আমি জীবনে যে-সকল ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তিনি নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে একজন।"

[এই প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের কোন কোন অংশের তাৎপর্য্যানুরূপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পরমহংসদেবের নিজস্ব বচনভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাইবে না। শাস্ত্রী-মহাশয়েরও বাংলা ইহা নহে।]

মর্মানুবাদ : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উৎস : *প্রবাসী*, চৈত্র, ১৩৪১।

জন্মোৎসব

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

চল, চল আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই! আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ, চল, আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক করি! বড় ভাগ্য না হইলে মর্ত্যলোকে এমন অপূর্ব রূপ এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চল, চল বাঙালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নব জাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নরদেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি! জান কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

রামকৃষ্ণকে চিনিতে হইলে হিন্দু-সাধনার গোড়ার কথা একটু বুঝিতে হয়। বিংশতি কোটি হিন্দু সন্তান জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঈশ্বর-ভাবের ভাবুক। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবদনকমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে, উহাই এই ঘোর কলি-যুগে হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের আচার-ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, আদান-প্রদান—সমস্তই কৃষ্ণ প্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। কত বিপদ বিপ্লব—কত ঘাত-প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণপ্রভাবে হিন্দু অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বসুদেবনন্দন, কংস-কেশী-চাণূর-মর্দন যে অমৃততত্ত্ব প্রচার করেন, তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, হিন্দুজাতির জ্ঞান ভক্তি ধর্ম কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ, নূতন শক্তি এবং নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে, সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদপদ্মনিঃসৃত জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগপ্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তিমকালে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন। এই সনাতন সত্যটি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগপ্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপী, তিনিই সেই যুগ-সম্ভাবনা। যাহা আমরা আমাদের সাধনা ও শক্তি বলে পারি না, তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কি করিতে আসিয়াছেন? হিন্দুর জীবন্ত ও বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট—বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন।

কথাটাকে মান্য করিতে ভুলিও না। তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের ধ্বজা উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়াছে। তোমার সমাজের ছায়া অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গী নরনারীগুলির কি প্রাণপণ আকিঞ্চন, তাহা জানো কি? কাহার কৃপায় ইহা হইয়াছে? তোমার গোলামখানার বিদ্যায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণের কৃপায়! রামকৃষ্ণরূপী ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে যদি আবার বরণ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়-নিশান আবার জগৎ জুড়িয়া উড্ডীন হইবে; তোমার স্বদেশী ও স্বদেশীয়ানা ধন্য হইবে।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে ভগবৎ-চরণবিনির্গত জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। এসো—এই জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে অঙ্গীকার করি। মূল ভ্রষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য। এসো, আজ সমগ্র দেশের সহিত—অতীত সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ প্রাণ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। কোটি বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে!

এই জন্মোৎসবদিনে রামকৃষ্ণকে সেই পারম্পর্যের সূত্র ধরিয়া পর্যবেক্ষণ কর—ধন্য হও।

উৎস : *বসুমতী দৈনিক*, ২ ফাল্গুন, ১৩৫১। *উদ্বোধন*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ পুনর্মুদ্রিত।

ভগবান রামকৃষ্ণ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।"

যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ধর্মরক্ষার জন্য আমি নরাকারে অবতীর্ণ হই।—ইহাই ভগবানের কথা। হিন্দুমাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। কথাটা বুঝিতে হইলে গীতার এই শ্লোকে ব্যবহৃত দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রথম—ধর্মের গ্লানি কাহাকে বলি; দ্বিতীয়—অধর্মের অভ্যুত্থানই বা কেমন?

সহজ অবস্থার বিকৃতিকেই গ্লানি বলে। অর্থাৎ, সামঞ্জস্যের নষ্ট হইলেই গ্লানি হয়। তোমার দেহ সুস্থ আছে, অর্থাৎ দেহরক্ষার সকল শক্তি সমানভাবে কাজ করিতেছে। এই সমানভাবের কাজে ব্যাঘাত ঘটিলেই দেহের গ্লানি হয়—রোগ জন্মায়। তেমনই সমাজ-শরীরের যে সকল শক্তি সমাজপুষ্টির পক্ষে সদা নিযুক্ত, সেই সকল শক্তির মধ্যে কোন একটা শক্তি নির্দিষ্ট কার্য হইতে যদি ব্যাহত হয়, এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহা হইলেই ধর্মের গ্লানি হইল, বুঝিতে হইবে। গ্লানির শব্দার্থ—বিকৃতি, ম্লান, দুঃখ, নিন্দা এবং বিপর্যয়।

ধর্মের গ্লানি হয় দুই উপায়ে। প্রথম—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বা বীরপুরুষের উপদ্রবে; যেমন হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস ইত্যাদি। দ্বিতীয়—সমাজের অঙ্গবিশেষের মোহে, বিলাসে, দুষ্ট আদর্শে সমাজে ধর্মের গ্লানি হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের বিলাস-উপদ্রবে সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পরশুরাম অবতার হইয়াছিলেন। ধর্মযাজক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভী ও বিলাসী হইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেব

অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন সমাজের সকল অঙ্গ শিথিল হইবে, সকল শ্রেণী বিগড়াইবে, তখন কল্কি অবতার হইবে।

অধর্মের অভ্যুত্থান, অর্থাৎ দুষ্ট-আদর্শের প্রাবল্য। রাবণ-রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন, সিদ্ধ সাধক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সাধনালব্ধ শক্তির দ্বারা কেবল বিলাসের পিপাসা মিটাইয়াছিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সতীর সতীত্ব রক্ষা হইত না, সাধক নিশ্চিন্তে সাধনা করিতে পারিত না, সাধক কুলাঙ্গনারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আদর্শে দেশটা লাম্পট্যে ভরিয়া গিয়াছিল। এই অধর্মের অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করিবার জন্য রামাবতার। রাম সংযতের, বিনয়ের, সমাজ-পক্ষপাতিতার, সামাজিক গুণ-গৌরবরক্ষার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। রাম রাবণের ঠিক antidote। রামের পিতা দশরথ, সেই দশরথের ষোল হাজার নারী—কামপত্নী। সেই রাম একপত্নীক, যথার্থ সংযমী ও সন্ন্যাসী। গৌতম বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কেবল কর্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, জ্ঞান ও ভক্তির কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে সংযম সন্ন্যাস একেবারেই ছিল না। ফলে তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দুষ্ট-আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য সিদ্ধার্থের উদ্ভব। ক্রমে তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য, যুবতী স্ত্রী, বিলাস-বৈভব সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর এমন আদর্শ দেখাইলেন, যাহার প্রভাবে সমাজের মূল পর্যন্ত টলিয়া উঠিল। ভার্গব পরশুরামও ক্ষত্রিয়দিগের বিলাসতেজকে সংযত করিবার জন্য ব্রহ্মতেজের বিকাশ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস ও সংযমের সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্য কেমনভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা ভার্গবের জীবনে বুঝা যায়।

ইংরেজের আমলে যখন আমরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি, তখন দেশের অর্থাভাব খুব হইয়াছিল। অথচ, বিলাসের স্পৃহা কম ছিল না। ইংরেজী শিখিলেই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই অর্থোপার্জন করা যাইত। ইহার ফলে সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্যের সৃষ্টি হইল। আর ইউরোপের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির দুষ্ট-আদর্শে মুগ্ধ পঙ্কিল বিলাসের স্রোতে আমরা গা-ভাসান দিয়াছিলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় আমলে আমরা সব ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব সর্বস্বই চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সর্ব-বিধ্বংসিনী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হইল

ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্ভবে। গঙ্গার তরঙ্গে যেমন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল—সে বেগ সামলাইতে পারে নাই, তেমন ব্রাহ্মসমাজও ইউরোপের বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

"তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"

তখন কৃপার সাগর সমাজের দুষ্ট-আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য—দরিদ্রের মান বাড়াইবার জন্য, দরিদ্রকে স্বর্ণসিংহাসন দিবার জন্য, সেবাব্রতকে সকল ব্রতের সার করিবার জন্য, কাঙাল-ফকিরের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য, ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কর্মের পথ দেখাইবার জন্য—

"রামকৃষ্ণ"

কৃপার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের ধর্মের গ্লানির সংহরণ ক্ষাত্রবীর্যে সম্ভবপর নহে। তাই তিনি দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণের বেশে বাংলার নিত্য শ্যামায়মান পল্লীবাসের শান্ত, স্নিগ্ধ ছায়ার তলে করুণা ও দয়ার, সংযম ও সন্ন্যাসের বিনয় ও বৈরাগ্যের, ঔদার্য ও তিতিক্ষার ঠাকুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের, সকল আচারের, সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাঙ্গালায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে তন্ত্রের ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেম ছিল, বৈষ্ণবের মাধুর্য এবং অপরাজেয় দৈন্য ছিল। তিনি তাঁহার বিশাল যুগল বাহুর দ্বারা বিশ্বমানবতার বিরাট পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের ঈশ্বরপদে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রের মহামন্ত্র যে নারীমাত্রেই জগজ্জননীর অংশরূপিণী—এই মন্ত্রে একা তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মা বলিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা ছিল না, উপেক্ষা ছিল না, অবহেলা ছিল না—পাপী, তাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ম্লেচ্ছ, যবন সকলকেই—সকল মানুষকেই তিনি

কোল দিয়াছিলেন। নব বসন্তের শুক্লপক্ষে নব-কিশলয় প্রতিবিম্বিত কৌমুদীধারায় আপ্লুত হইয়া শুক্লাম্বর—শুক্লভাবপূর্ণ, শুক্লতেজোময়, শুক্লকর্মময়, শুক্লভক্তিশ্রমও মহাপুরুষ ভগবানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে সুশিক্ষার ও সদুপদেশের মন্দাকিনীধারা ব্রাহ্মণ্যের ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী যদি মানুষ হয়, তবে তাহা পান করিয়া নিশ্চয়ই অমরত্বলাভ করিবে। যাঁহারা ভগবান রামকৃষ্ণের সেবাব্রতের গৈরিক-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, সমাজকে অপূর্ব আদর্শ দেখাইয়া মুগ্ধ করিতেছেন, ভগবান রামকৃষ্ণের করুণার আশিস কোটি ধারায় তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। তাঁহারা সর্বসিদ্ধির পথে অগ্রসর হউন।

উৎস : *প্রবাহিণী*, ২২ ফাল্গুন, ১৩২০।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নলিনীকান্ত গুপ্ত

১

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সার—এক কথায় ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম্মের, ভগবৎ-সাধনার, আত্মানুভূতির বহু পথ ও মত আছে—তাহাদের এক একটি ধরিয়া এক একটি মার্গ, সম্প্রদায়, এমন কি জাতি পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও তন্ত্র মার্গ, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান জাতি—ইহারা প্রত্যেকে ঘোষণা করে ও বিশ্বাস করে যে আসল ও পূর্ণ সত্য সেই পাইয়াছে এবং অতিরিক্ত গোঁড়া যাঁহারা তাঁহারা নিজের সত্যকে সত্য বলিয়াই সন্তুষ্ট নহেন অপরের সত্যকে মিথ্যা, অন্তত অর্দ্ধ বা ইতর সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা—শুধু চিন্তা জগতে বিচারের ও তর্কসিদ্ধান্তের দ্বারা নয়—প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যাবতীয় ধর্ম্মপথের, অধ্যাত্মসাধনার মূল এক ও অভিন্ন। একই মূল সত্যকে নানা নামে, নানা রূপে, নানা রঙে মানুষের প্রতীতি অভিব্যক্ত করিয়াছে। সে মূল সত্য সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়—তাহা অনন্ত অনির্ব্বচনীয়; স্বরূপে তাহা অরূপ, নির্গুণ নিরাকার, অবাঙ্মনসগোচর—তাহাই আবার রূপের মধ্যে সাকার, সগুণ, সান্ত; তাহা পরম জ্ঞান, পরম শক্তি, পরম প্রেম—আবার তাহাই নেতি নেতি, নির্ব্বিকল্প, কৈবল্য, শূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের, অধ্যাত্মের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়াছেন, কারণ তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ঐ মর্ম্মের পথে। শুদ্ধ বৈদান্তিক ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চলেন জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বিচার বিতর্ক, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথে; তিনি মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া মস্তিষ্কের

উপর উঠিয়া যান, তাহার সত্তার চেতনার মুখ্যতঃ হইল এই ঊর্ধ্বায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ একই ব্রহ্মোপলব্ধিকে পৌঁছিয়াছেন ঐ রকম বুদ্ধির ঊর্ধ্বায়নের ফলে ততখানি নয় যতখানি হৃদয়ের মধ্যে, অন্তর্হৃদয়ের মধ্যে—এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে,—গভীর অভিনিবেশের, অবগাহনের ফলে; অন্তরাত্মার অতলে তিনি এতখানি চলিয়া গিয়াছেন যে পরিশেষে দেখি তিনি সেই একই ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আবার হৃদয়পথে তিনি অতখানি গভীরে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণ বৈষ্ণবসুলভ ভাববিলাসিতা, আবেগ আতিশয্য অতিক্রম করিয়া তিনি একটা ভাবঘন স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। আর তান্ত্রিকের প্রাণশক্তি সাধনায় অবান্তর উপাঙ্গ সব পরিহার করিয়া, উহার মূলতত্ত্ব যে প্রাণকে মায়ের চিন্ময় শক্তিতে ভরিয়া তোলা তাহা সংসিদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন সে প্রাণকে অন্তরাত্মার তীব্র আস্পৃহা-বহ্নিতে সমিদ্ধ ও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার বৈশিষ্ট্যই হইল, এই অন্তঃপুরুষের একাগ্র একান্ত তীব্র আস্পৃহা, তাহার নৈসর্গিক অযত্নসুলভ বিবেক বৈরাগ্য পরানুরক্তি ও সমাহিতি অন্তশ্চেতনার সেইসব সহজ আদিশক্তি যাহাদের সহায়ে পথের জটিলতা কুটিলতা দীর্ঘতা হইয়া উঠে সরল ঋজু হ্রস্ব। এক একটি সাধন ধারা, স্বাভাবিক গতিতে চলিলে যাহাতে প্রয়োজন হয়, সমস্ত জীবন, এমন কি একাধিক জীবন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র-প্রয়াসপূর্ণ জীবন, তাহাদের প্রত্যেকটি তিনি আপনার অন্তঃপুরুষের প্রদীপ্ত চেতনার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়াছেন, হেলায় যেন তাহার সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানে ছিল স্বয়ংপ্রকাশ অব্যর্থতা, সহজ নিশ্চয়তা, তাঁহার ভক্তিতে প্রীতিতে অকুণ্ঠ আত্মদানের নিবিড়তা ও সারল্য—কিন্তু তাঁহার শক্তি আরও চমৎকার, অনির্ব্বচনীয়। কারণ, এই শক্তির বাহ্য আড়ম্বর নাই, জোর-জবরদস্তি নাই, নাই উগ্রতা প্রচণ্ডতা—এত স্বাভাবিক, এত কমনীয়, অথচ এত তেজোময় সামর্থ্যময়। সে ব্রাহ্মণ্যশক্তির কিঞ্চিৎমাত্র বিবেকানন্দের বিপুল ক্ষাত্রবিক্রমে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছিল। কারণ সে শক্তি অন্তঃপুরুষের সহজাত অঙ্গভঙ্গ, চেতনার নিজস্ব ছন্দ, সত্তার আপন প্রভা বিকীরণ।

২

জগতে যুগে যুগে যে মহাপুরুষেরা অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা এক একটি সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক ঘটনামাত্র নয়। স্থূলপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্রমবিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি—সেই রকম আধ্যাত্মিক বা অন্তশ্চেতনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছে এক ক্রমবিবর্ত্তন। অবতার, বিভূতি—ইহারা এই ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্ন ও বিবিধ সোপান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক এক জন উপর হইতে এক একটি বিশেষ চেতনা ঐহিকের মধ্যে নামাইয়া ধরেন, মানব-চেতনার পক্ষে তাহাকে আয়ত্ত করা বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য করিয়া তোলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে এক যুগাবতার ছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে মূর্ত্ত করাইয়াছেন "অধিমানস" চেতনা—মনের বুদ্ধির অব্যবহিত উপরে যে বিশ্বগত সার্ব্বভৌম চেতনা—যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি গীতার বিশ্বরূপদর্শনে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। বুদ্ধের অবদান "বোধি" ঊর্দ্ধতর, সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ বুদ্ধি; এই বৃত্তির ভিতর দিয়া, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানবচেতনার গোচর করিয়া ধরিয়াছেন। শঙ্করের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা আরও এক ধাপ কাছে আসিয়াছে—কারণ, শঙ্কর হইলেন তর্কবুদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার অবতরণ, অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে তর্ক বুদ্ধির উন্নয়ন। খৃষ্ট অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানুষের আরও ঘরের কাছে আনিয়া, মানুষের আপনার এবং অন্তরঙ্গ করিয়া দিয়াছেন—অধ্যাত্ম-চেতনাকে হৃদয়ে নামাইয়া আনিয়া, ফুটাইয়া ধরিয়া, উপলব্ধি করিয়া এবং উপলব্ধি করাইয়া। মহম্মদের মধ্যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল অধ্যাত্মচেতনাকে কেবল মনে নয়, হৃদয়ে না—প্রাণের কর্ম্মৈষণার মধ্যে, জীবনীশক্তির মধ্যে আরও বাস্তব, আরও সজীব ও মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে। চৈতন্যের মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছিল এই প্রাণেরই আর এক অংশের দীক্ষা বা অধ্যাত্ম-উপনয়ন—যাহা হইল কামনার, আসঙ্গ-লিপ্সার, আবেগের ক্ষেত্র।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, এই সকল মহাপুরুষেরা যে যে বৃত্তি ধরিয়া অধ্যাত্ম-চেতনা উপলব্ধি করিয়াছেন বা যে যে বৃত্তিকে অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভায় রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে

ব্যক্তিগত ভাবে আর কেহ সে বিশেষ সাধনা করে নাই বা তাহাতে সিদ্ধি পায় নাই; আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত চেতনার কথা—মানুষের মধ্যে, একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীগত সিদ্ধির পথ ও সম্ভাবনা ইহারাই আপন আপন ভাবে তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। আগে যেখানে গভীর জঙ্গলে পায়ে-চলা পথের দাগ ছিল কি না ছিল, হয়ত ছিল শুধু দূরে দূরে দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদচিহ্ন মাত্র—সেখানে এই সকল অবতার বিভূতিগণ পাকা সড়ক যেন বাঁধাইয়া দিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে সহজেই ও পথে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে।

৩

মন প্রাণ শুধু নয়, স্থূল চেতনা দিয়া ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করা, দেহের মধ্যে দেহকোষেরই মর্ম্মে দেহগত অন্তঃপুরুষের জাগরণ—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে যেন এই পার্থিব লোকেরই আত্মা সচেতন হইতে চাহিয়াছে। আমি বলিয়াছি রামকৃষ্ণ হইলেন মূলত হৃদ্‌পুরুষের দিব্য-চেতনা—এই হৃদ্‌পুরুষই ব্যক্ত-আধারের, দেহপ্রাণমনের নিগূঢ় অধ্যক্ষ, ইহারই মধ্যে আসিয়া আধারের সকল নাড়ী মিলিয়াছে। হৃদ্‌পুরুষেরই সম্যক জাগরণে, মনোময় প্রাণময় এমন কি অন্নময় পুরুষ জাগ্রত হয়—ভগবৎমুখী হয়, চায় আত্মার সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য। মানুষের এই অন্তঃপুরুষ চিরদিনই ভগবানকে চাহিয়া আসিয়াছে—তাহার স্বাভাবিক গতিই হইল অধ্যাত্মের দিকে; মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে একটা ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন আছে, তাহার মূল এইখানে। অন্তরাত্মার চেতনা যতখানি জাগ্রতের মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই জাগ্রতও ততখানি ভগবৎমুখী হয়, ভগবৎ সত্তায় গড়িয়া উঠে। অন্তরের চেতনা ধরিয়া, অন্তরের ঊর্দ্ধতর লোকে স্থিতিতে উঠিয়া যাওয়া মানবচেতনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ অতীতে বেশীর ভাগ সাধনমার্গের লক্ষ্য এই ধরণের ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে অধ্যাত্মসাধনার মোড়টি যেন ঘুরিয়া গিয়াছে। অতীতের সকল সাধনার ধারা তিনি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের সারটি আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইভাবে চেতনাকে, আধারকে বিশুদ্ধ করিয়া, শাণিত করিয়া,

ভরাট করিয়া তাহাকে প্রযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এক নূতন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য আর কিছু নয়—জাগ্রতে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা, আধিভৌতিক অধ্যাত্মের রাজ্য স্থাপন করা, এই জড়-আয়তনকে, এই নিরেট নিথর অজ্ঞানকে পরম জ্যোতির আনন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত, রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অবশ্য এই লক্ষ্যটি ঠিক এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য চেতনায় যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সজ্ঞানে এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি কাজ করিতেছিলেন, এমন হয়ত বলা চলে না। কিন্তু এই লক্ষ্যের ভিত্তি তিনি গড়িয়া দিয়াছেন, এই লক্ষ্যের দিকে গতির সূচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্বের দিক হইতে তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের সাথে সাথে তন্ত্রের উপর সমান—বা অধিকতর—জোর দিয়াছেন। তাই কামিনীকাঞ্চন লইয়া, ব্যাধি লইয়া তাঁহাকে বিশেষ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ভোগ করিতে হইয়াছে। নতুবা আশ্চর্য্য বোধ হয় না কি—অনেক সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পতর শক্তি লইয়া এতখানি দ্বন্দ্বসংঘর্ষের হাত এড়াইয়া গিয়াছেন কি রকমে? রহস্যের মীমাংসা এই হইতে পারে—নিম্নতর প্রাণের মধ্যে, স্থূল দেহেরও মধ্যে অন্তরাত্মার জ্যোতি ও আস্পৃহা শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে ধরিয়া নামিয়া আসিতে চাহিয়াছে, যাহাতে এই নিম্নতর ও নিম্নতম অঙ্গেরও অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠে, ইহারাও চায় ভগবানকে, অধ্যাত্ম-চেতনাকে। অবশ্য এই ধারার শেষ বা পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ নহেন, তাঁহার কাজ শেষ করা নয়, সুরু করা—তিনি পরিণতি নহেন তিনি হইলেন নবজন্ম।

এই দিক হইতে দেখিলে তাই আমরা বলিতে পারি, পার্থিব চেতনার জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত ভাগবত চেতনা—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাগবত চেতনা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে তাহার লোকাতীত স্থিতি হইতে এই লৌকিকের দিকে—সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলতরের মধ্য আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে; কিন্তু এ -যাবৎ স্থূলতম স্থূলকে তাহা স্পর্শ করে নাই—আর এই জন্যই সূক্ষ্মতর জগতেও সাধারণভাবে অধ্যাত্মের অবিসম্বাদী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৈবদুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া দ্যুলোক আসিয়া ভূলোককে স্পর্শ করিয়াছে।

স্বর্গ পৃথিবীতে আসে নাই, কারণ পৃথিবী স্বর্গকে চায় নাই—আত্মা দেহকে অমৃতময় করিয়া তোলে নাই, কারণ দেহ নিজে আত্মাকে চিনে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হইলেন স্বর্গের সেই যাদুস্পর্শ, আত্মার সেই স্ফুলিঙ্গ যাহা পার্থিব আয়তনের অন্তর্যামীকে জাগ্রত করিয়াছে, শারীর আত্মাকে, অন্নময় পুরুষকে সচেতন করিয়া ঊর্ধ্বমুখী করিয়াছে।

আবার বলি রামকৃষ্ণের নিজের লক্ষ্য এইরকম ছিল অথবা সজ্ঞানে এই আদর্শের সাধনা তিনি করিয়াছেন তাহা হয়ত নয়। আমি বলিতেছি তাঁহার সাধনার স্বাভাবিক পরিণতির কথা, বিশ্ব-প্রকৃতি বা ঊর্ধ্বতর প্রচ্ছন্ন চেতনা তাঁহাকে কোন সার্থকতার যন্ত্র করিয়াছে সেই রহস্য।

বহিরায়তন অবধি, একান্ত স্থূল অঙ্গ ও ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অন্তঃপুরুষের ভাগবত চেতনার প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তার—নবযুগে অধ্যাত্মের এই অভিযান ও দিগ্‌বিজয় মূর্ত্ত হইয়াছে বিবেকানন্দের মধ্যে। বাহির অপেক্ষাও বাহির স্থূল হইতেও স্থূল হইয়া পড়িয়াছে মানুষের চেতনা যে দেশে, পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্য সেই আধুনিক আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই তেজঃস্ফুলিঙ্গটি কেন ও কি উদ্দেশ্যে যে আসিয়া পড়িল, তাহার অর্থ আমরা বুঝি এইরকমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর, অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্ত্তনে মানব চেতনার একটা নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত।

উৎস : *বিচিত্রা*, মাঘ, ১৩৪২।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

বনফুল

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন-কাহিনী পৃথিবীর সুধীসমাজে সুবিদিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্তু এ কথাটা হয়তো অনেকে জানেন না ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ যে প্রতিভা যে প্রেরণা থাকে তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। তাঁহাকে অনেকটা চিনিয়াছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যেভাবে বুঝিয়াছি তাহাই কেবল আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। হাতীটিকে ঘিরিয়া হাত দিয়া দিয়া তাহারা হাতীর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা হাতীর পা-টাই স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী থামের মতন, যাহারা কানটা স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ করিল তাহাদের ধারণা হইল হাতী সাপের মতন। আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি লোকেরা যখন মহাপুরুষ-জীবন আলোচনা করিতে যায় তখন এইরূপ হাস্যকর ব্যাপারটাই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, কারণ মহাপুরুষের নামকীর্তনই হয়তো আমার অন্ধত্বমোচন করিয়া দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে বিধৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে অবতার বলি।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণী-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সে বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও মতে মানুষ সামাজিক। Burke বলিয়াছেন—"Man is an animal that cooks his victuals." Adam Smith মানুষের আরও বৈষয়িক সংজ্ঞা দিয়াছেন—"Man is an animal that makes bargains", কবি বায়রনের ভাষায়—"Man is half dust, half deity, alike unfit to sink or soar; a pendulum betwixt a smile and tear." শেক্সপীয়রের ভাষায়—"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties!" কিন্তু 'গীতা'য় বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ে মনুষ্যরূপী শ্রীভগবান এবং দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-মহর্ষির কন্যা বাক্ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উইপোকা উইঢিপি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। এক জাতীয় পাখী এক জাতীয় নীড় নির্মাণ করিতেই দক্ষ। অতি স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্তি নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে—সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধজীবনের অবসান করিয়া কৃষিসভ্যতার পত্তন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতো তাহার প্রকৃতিও যেন সতত সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-ভূমি
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের বিজয়বার্তা।

তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মানব পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান দুরন্ত অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিয়া লই নাই। সে রাত্রের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোনও সীমা, কোনও গণ্ডিকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বেতার, বিমানপোত, টেলিভিশন, পুস্তক, মুদ্রাযন্ত্র বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে তাহাকে নিত্য নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়। নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে বস্তুজগতে নিত্য নব আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করিল যাহা তাহার সমস্ত পূর্ব-আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিল, যাহার নিকট সমস্ত বস্তু-মহিমা তুচ্ছ হইয়া গেল। এতকাল যে পশু মানব আহার-নিদ্রাদির বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর ছিল সহসা সে আত্ম-আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অনুসরণ করিতে করিতে মানবের সৃষ্টিপ্রতিভা যখন তমসাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রান্ত তখন সহসা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্/আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", ধ্বনিত হইল যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তাহা—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তাহা—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল, সহসা সে আবিষ্কার করিল—ভূমৈব

সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই আত্ম-আবিষ্কার এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অধ্যাত্মজগতের নূতন আলোকে তাহার আধিভৌতিক জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিল। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।

শ্রেয় এবং প্রেয়—ধর্মবুদ্ধি এবং বিষয়বুদ্ধি—সম্মিলিত ভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, অল্পবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে চিরকাল বেশি। বস্তুজগতে প্রাধান্যলাভ করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষ তখনও যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে। বন্যমানবের নখদন্ত সভ্যমানবের নানা অস্ত্রশস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, তোমর, অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পট্টিশ, ভল্ল, চক্র, লাঙ্গল, ভূশুণ্ডী, চর্ম প্রভৃতি বর্তমানে গুলি গোলা বন্দুক কামান শ্র্যাপ্‌নেল, আণবিক বোমা, উদ্‌বোমায় পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মানুষই জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন জীবনযাত্রার নামকরণই করিয়াছেন struggle for existence. আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের গল্প। দেব-অসুর, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের চণ্ডী রণরঙ্গিণী, আমাদের দেবতারা কেহ ত্রিপুরারি, কেহ কংসারি, কেহ বৃত্রনিসূদন। শুধু আমাদের পুরাণেই নয়, মিশরীয় পুরাণের রা এবং আইসিসের গল্প, ব্যাবিলনের ইয়া এবং তিয়াম্মতের কাহিনী, প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার ওবেলিথের গল্প, সবই দ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস, অল্পবুদ্ধি প্রেয়-কামী মানব-মানসের প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও তাই। ব্যক্তির বা জাতির অতি স্থূল বৈষয়িক জয়-পরাজয়ই তাহাতে প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে। শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ মানবই প্রেয়কামী একথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য সমস্ত মানবজাতি ওই মুষ্টিমেয় শ্রেয়কামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে—যাহারা জীবনকে 'যুদ্ধ' না বলিয়া 'লীলা' বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যে করা হয় নাই তাহা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইঁহাদেরই চরণে সমর্পিত হইয়াছে। ঘৃণ্যতম ভোগীও অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত করিয়াছে।

অধিকাংশ মানুষই লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু মনে হয় সেজন্য তাহারা যেন মনে মনে লজ্জিত, তাই লুণ্ঠন করিবার সময় তাহারা ধর্মের মুখোশ পরিয়া লুণ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোশের দ্বারাই তাহার বাঁকা পথে সত্য শিব সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছে।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।

এই মহাবাণীর নিগূঢ় সত্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

ইহারা সংখ্যায় বেশি বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিকণা অসংখ্য, কিন্তু সূর্য এক। সেই একটি সূর্যের ভাস্বরতায় অসংখ্য ধূলিকণা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্বতন আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে—বিমানপোতের নিকট গরুর গাড়ি আজ যেমন অকিঞ্চিৎকর, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক যেমন হাস্যকর—মানবজাতির অগ্রগতিতে অধ্যাত্ম-জগতের আবিষ্কারের কাছে আধিভৌতিক জগতের ঐশ্বর্য আজ তেমনি হীনপ্রভ। শ্রেষ্ঠ মানবমনীষা আর অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নাই, নিত্যবস্তুর সন্ধানে সে উৎসুক। তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে নয়, আসক্তি-বন্ধনের বিরুদ্ধে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গুণাতীত হইতে চান—

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।

যাঁহার কাছে সুখদুঃখ সমান, যিনি আত্মস্থ, যাঁহার কাছে মাটি পাথর সোনা তুল্যমূল্য, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, শত্রুমিত্র, স্তুতিনিন্দা যাঁহার দৃষ্টিতে সমান, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নন—তিনিই গুণাতীত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতেই সমুৎসুক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সাধনা সংখ্যাগরিষ্ঠ পশুর দলকে ধীরে ধীরে পশুত্বর স্তর হইতে মুক্ত করিতেছে। অধ্যাত্মজগতে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই জয়ী নয়।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয় যে পশুমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল কি প্রকারে? তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানবমনের অন্তহীন কৌতূহল। সে চিরকালই প্রকৃতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, তাহার অমোঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধনা করিয়াছে। এজন্য তাহার কৌশল ও তপস্যার অন্ত নাই। এই পথেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে যাহা কিছু বস্তুসংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। জীবন, যৌবন, পুত্র, কলত্র, মান, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার পরিণাম সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যক্ষ মৃত্যুই মানবের প্রথম ধর্মগুরু। তাই বোধ হয় 'কঠোপনিষদে'র ঋষি মানবসন্তান নচিকেতাকে যমের সম্মুখীন করিয়া যমের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মৃত্যুই—এই অনিত্যবিধ্বংসী মহাকালই—শেষে তাহার নিকট দেবতা-রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষরূপে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে তিনিই মহাকালী। নানা রূপে নানা মূর্তিতে নানা প্রতিমায় মহাকাল ও মহাকালীর পূজা মানবসমাজে প্রচলিত। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কর রূপও তাহার নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুই যে নবজীবনের সূচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই যে নবসৃষ্টির বীজ নিহিত আছে এ সত্য মানবকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। ধ্বংসকর্তা মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণুও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে

বিজড়িত। মহাকালীর হস্তে কেবল খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ডই নাই, বরাভয়ও আছে।

এই পথেই—জীবনের সমস্ত কিছু নশ্বর এই উপলব্ধির ফলস্বরূপই—সে আর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছে—ভালবাসা। যাহা থাকিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ যে মায়া তাহাই ভালবাসার আদি রূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে। পরমহংসদেবের বিচিত্র অধ্যাত্মজীবনের দিগ্‌দর্শনও এই দুইটি জিনিস—মহাকালী এবং প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজগতের একজন দিকপাল। বস্তুজগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ যেমন সৃষ্টিধর্মী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশেষ একটি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি সৃষ্টিধর্মী। প্রথম জীবনে তাঁহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা কবি ও ভক্তের রূপ। তাঁহার কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার যদি কেবলমাত্র কবি-কল্পনা থাকিত তাহা হইলে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ কবির মতো কবিতাই রচনা করিতেন, আমরা সাধক রামকৃষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা একজন সাধক পাইতাম বটে কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'র কবি রামকৃষ্ণকে পাইতাম না।

যেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
> ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
> সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা
> বসন্তের এই সঙ্গীতে।

সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিয়াছেন—এই কি তিনি, এই কি তিনি! তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তো ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। অনেকে তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক

বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। শফরীরা গণ্ডূষ মাত্র জলেই তো ফরফর করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে কেবল বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। এ যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Alexis Carrel কিন্তু বলিতেছেন—"Intelligence alone is not capable of engendering science." তিনি আরও বলিতেছেন—"Certainty derived from science is very different from that derived from faith. The latter is more profound."

এই profound (গভীর) বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে profound দৃষ্টিভঙ্গীও প্রয়োজন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরে কৃষ্ণমেঘের পটভূমিকায় সাদা বকের সারি যে বালককে অভিভূত করিয়াছিল, যাত্রার শিব সাজিয়া শৈশবেই যিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীপ্রতিমার স্পর্শমাত্র যাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়া যিনি যীশুখৃষ্ট-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ-প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় যিনি আহার নিদ্রা বস্ত্র উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন, অবশেষে যাঁহার অদর্শনে অধীর হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি কালী দুর্গা শিব সীতা রাম হনুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত কবি-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবিশ্বাসীর নাই। যাহা অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরস উপভোগ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের মর্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার এই যে তাঁহার কবিমানসের কল্পনা ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানসদেবতাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোনও শাস্ত্রচর্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশভিক্ষা করেন নাই। তাঁহার কবিমানস

অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছে তাহাই সফল হইয়াছে। Plato-র Utopian স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় প্রতিমাই সজীব হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের সুকঠিন দুর্গম পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুরা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ শিষ্যই সন্ধান করে, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতই ঘটিয়াছে—প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে তোতাপুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজেদের তাগিদেই যেন তাঁহাকে সাধনমার্গে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকেই খুঁজিতেছি। প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে আসিয়াছি।'

শুধু যে তাঁহার গুরুরা আসিয়াছিলেন তাহাই নয়, বাঙলাদেশের তদানীন্তন মনীষীবৃন্দ—গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং বেঙ্গলের দল, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ—দলে দলে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও তাঁহার অনাগত শিষ্যদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের ডাক দিতেন—"ওরে কোথায় তোরা, আয়, আমি যে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না।" তাঁহারা একে একে আসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী দেশে দেশান্তরে ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা লইয়া অটল হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বসিয়া ছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্মমূলে আজও বোধ হয় আছেন এবং ভবিষ্যতে নূতন যুগের নূতন আলোকে নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তিনি তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিবেন।

এই ধর্মরাজ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। 'গীতা'য় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

অনেকেই বলেন—পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া গেল, পাপীরাই তো বিজয়পতাকা উড়াইয়া সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, পরিত্রাতা ভগবান কবে, কি ভাবে, কোথায় আসিয়া ধর্ম-স্থাপন করিবেন?

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ভগবান কখন কি ভাবে আসিয়া যে ধর্মসংস্থাপন করিবেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার যে প্রয়াস চলিতেছে কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। সর্বযুগেই যে তিনি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন এমন না-ও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিন্ত নাই তাহার কিছু আভাস আমাদের ইতিহাসেই আছে। ভারতে যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা তাহার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছে, তখনই একজন করিয়া মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদিও শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের হুবহু নকল নন কিন্তু উক্ত দুই অবতারের বাণী এবং আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্যাবর্ত যখন কর্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় কাতর, তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও যখন কালক্রমে গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন ধর্মজগতে জন্মগ্রহণ করিলেন শঙ্করাচার্য এবং রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন মুসলমান। অধঃপতিত বৌদ্ধেরা অনেকেই মুসলমান হইতেছিল, সুলতান মাহমুদ যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছেন তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামানুজ। তাহার পর বাঙলাদেশে পাঠানদের হিন্দুবিদ্বেষ যখন চরমে উঠিয়াছে তখন নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাঙলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন চৈতন্য এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। তাহার পর প্রায় তিন শত বৎসর অন্ধকার। মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্মজগতে অন্ধকারময় যুগ। তবু এই অন্ধকারময় যুগের শেষভাগেও যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম বিপন্ন, তখন যে বীরের কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য শিবাজী।

তাহার পর আসিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাঙলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচারিতা করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতনা ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে সেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয় তখন রামমোহন চারি বৎসরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের হস্তে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছে তখন ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে—জন্মগ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাঙলাদেশে নব্যহিন্দুধর্মের প্রথম উদ্গাতা এবং তাহার কিছুদিন পরেই—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে—দয়ানন্দ সরস্বতী, আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মোহ এবং নূতন ধরনের পাশ্চাত্ত্য গোঁড়ামির বিষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই ইংরেজী ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে। যাঁহার জীবন ভবিষ্যতে সকল প্রকার মোহ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিলেন ঠিক তাহার এক বৎসর পরে—১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে। তাহার দুই বৎসর পরেই জন্মিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ—সেই মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা। ইহার কিছুকাল পরে—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাহার নাম দিয়াছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই, ভারতসন্তানের রক্তেই সেদিন ভারতভূমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যে রক্ত শুকাইতে না শুকাইতেই যে কয়জন ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিতে শ্রীরামচন্দ্রও পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ পারেন নাই—দুই-একটা

রাবণ কংস জরাসন্ধ দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্র। এত বড় বিরাট একটা কাজ—পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পুণ্যের সার্বভৌম প্রবর্তন—সহজে অল্প সময়ে হয় না। বহু কল্প প্রয়োজন। পৃথিবী এককালে জলময় ছিল—বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে স্থলের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মরাজ্যও একদিন সংস্থাপিত হইবে; নিগূঢ় অন্তরালে তাহার আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্গিত নাই? যে মানব একদিন বর্বর বন্য পশু তাহাদেরই মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল যাঁহারা চরিত্রে শঙ্করের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমা, ইসলামের মহত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রেম একই সঙ্গে বিরাজমান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার মধ্যে শুধু করুণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, 'শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্মকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও ধর্মের সহিত কোনও ধর্মের বিরোধ নাই, যাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরমাত্র, যিনি জানিয়া ছিলেন কিছুর সহিতই কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই—কারণ সমস্ত কিছুই সেই বিরাট ঊর্ধ্বমূল নিম্নশাখ ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মাত্র—সমস্ত কিছুরই মূল ঊর্ধ্বে শাশ্বত ব্রহ্মে। এরূপ লোকের মানবসমাজে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই?

অর্থ যে আছে তাহা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সেই সমন্বয়ের সুর যেন আজ পৃথিবীর মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত হইতে শুরু করিয়াছে। হয়তো ক্ষীণভাবে, কিন্তু শুরু যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের চক্ষে জড় ও জীবের সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। বিভিন্ন বস্তুর বৈষম্যের যে কারণ আজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাও সমন্বয়ধর্মী, সমস্ত বস্তুরই বাহিরের স্থূলরূপ যে পরমাণু-নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল একথা আজ তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। স্বর্ণ ও লৌহের বৈষম্য আপাতবৈষম্য—আসলে তাহারা ইলেক্ট্রন-প্রোটনের বিভিন্ন লীলামাত্র একথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য।

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দৃষ্টি দেখা দিয়াছে। সর্বদেশের মনীষীরাই আজ সমন্বয়ের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকার Wendel Wilkie তৎপ্রণীত *One World* পুস্তকে বলিয়াছেন—পৃথিবীর মানসিক ভারকেন্দ্র ধীরে ধীরে স্থান-পরিবর্তন করিতেছে। Aldous Huxley এবং Maugham-রা বেদান্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, রম্যাঁ রল্যাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। হাওয়া বদলাইতেছে সন্দেহ নাই। League of Nations অথবা United Nations-এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে চলিবে না, হয়তো আরও দুই-একটা মহাযুদ্ধ আমাদের বিভ্রান্ত করিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলনের পথ মিলিবেই। মানুষকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ-প্রস্তুতির আয়োজন করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয়া তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমাদের পরবর্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে। সম্রাট অশোকের সমসাময়িক ব্যক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি।

আজ আমাদের ঘোর দুর্দিন সন্দেহ নাই। দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের ভিতরেও আছে। যে ধর্ম ভারতের প্রাণস্বরূপ আজ আমরা সেই ধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে রাজনীতির উপর—যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা। আমরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পশু হইয়া পড়িতেছি। পাশব শক্তির আপাত-উন্নতি আমাদের সকলকেই পশুত্বের স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আমরা বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর প্রার্থনা করি না, সভায় বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করি। দুর্দিন পুরাকালেও বহুবার আসিয়াছিল। তখন আর্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কংসের অত্যাচারে যখন সকলে সন্ত্রস্ত তখন আর্ত মানবমানবী যে প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয়

নাই। আসুন আমাদের এই দুর্দিনে পুরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দম-পিচ্ছিল পথ; মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘগর্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্তরক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখোমুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই। রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী, আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। রুদ্ধনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি—হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; জননীর বক্ষে স্তন্য নাই, ক্ষুধিত শিশুরা ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে পীড়নে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।"

তাঁহাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। আমরাও যদি তেমনি করিয়া প্রার্থনা করি ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি।

উৎস : কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ : ভাবনা-ভুবনে

ধর্মসমন্বয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান

রেজাউল করীম

ঊনবিংশ শতাব্দীর যখন আরম্ভ হল তখন ভারতের ইতিহাসে কি দেখলাম? একদিকে বৃটেন দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ শাসন করছে, আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান ও আরও কয়েকটি ধর্ম পরস্পর ঝগড়া করছে। ধর্মপ্রচারের নামে এক ধর্মের নেতা অপর ধর্মের নেতাকে আক্রমণ করছে। এক ধর্ম অপর ধর্মকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তর্কাতর্কি, অপর ধর্মের নিন্দা, ধর্ম প্রচারের নামে অপর ধর্মকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করবার প্রচেষ্টা চলছে। তার ফলে ভারতবর্ষে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক কলহ আরম্ভ হল। এইসব কলহ-বিবাদের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে চাই যে, মানুষের জীবন তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবছিল, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কেউ কি নেই যিনি শান্তকণ্ঠে বলবেন : ক্ষান্ত হও, ঝগড়া নয়, বিবাদ নয়, বন্ধুত্বের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মানুষ বাস করবে? এক সময় তারা দেখল, তাদের এই দেশেই আবির্ভূত হয়েছেন এমন একজন মানুষ। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস।

রামকৃষ্ণ পরমহংস এ-যুগের একজন বিরাট মানুষ। যে-যুগে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব-কলহ প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সেই যুগে তিনি এক উদার ধর্মবোধের কথা উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, ধর্ম নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণ নেই। তাঁর মূল বাণী হল : ''যত মত তত পথ।'' তর্কশাস্ত্রে একটা কথা আছে 'contradictory thought' অর্থাৎ পরস্পর-বিরোধী চিন্তা। এই মত অনুসারে একটা কথা সত্য হলে

তার বিরোধী কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সর্বজনীন হ্যাঁ-সূচক যে কথা—তার বিরোধী সবই হবে সর্বজনীন না-সূচক কথা। 'ঈশ্বর সর্বত্র আছেন'—এই কথার বিরোধী কথা হল 'ঈশ্বর কোথাও নেই'। দুটোই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। তেমনি ধর্মের ব্যাপারে কেউ যদি দাবি করে তার ধর্ম সত্য এবং তার উত্তরে অপর কেউ যদি বলে, না তোমার ধর্ম মিথ্যা, আমার ধর্ম সত্য, সে ক্ষেত্রে ঠিক কথা কে বলবে? সেজন্যই জগতে ধর্ম নিয়ে বিরোধ। রামকৃষ্ণ পরমহংস বললেন, 'সকল ধর্মই সত্য। ধর্মের ব্যাপারে তুমি যে-পথই আন্তরিকতার সঙ্গে অবলম্বন কর না কেন সে পথই সত্য।' এমন দৃঢ়ভাবে ধর্মের কথা খুব কম লোকই বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের এই মহাসাধক পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করলেন : তোমরা ধর্মের নামে বিবাদ করো না। সব ধর্মই সত্য-পথের নির্দেশ দিয়েছে। নিজ নিজ পথ অনুসারে মানুষ চলুক। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না, কেউ কারও সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। সবাই এক হয়ে চলুক এক লক্ষ্যের দিকে। পথ যতই বিভিন্ন হোক না কেন সেই লক্ষ্য যে একই ঈশ্বর। কেউ তাঁকে জেহোবা বলে, কেউ বলে ভগবান, কেউ আল্লা বলে, কেউ বলে গড। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে-কথা বললেন—তা কেবল তাঁর মুখের কথা নয়, তাঁর অন্তরের উপলব্ধির কথা। তিনি তাঁর জীবনে প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মের মূলনীতি ও আদর্শ নিজের জীবনে পালন করেছেন। আবার হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণা, পূজা-উপাসনা, যোগসাধনা এসব তো তিনি অনুশীলন করেছিলেনই। খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেও তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ঐভাবেও একইভাবে ঈশ্বর লাভ হয়। আবার ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেও সেইভাবে কিছুদিন তিনি চলেছেন। সেই পথে এক চিরন্তন নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা করেছেন, ইসলামের প্রবর্তকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং সুফিদের মতো কঠোর সংযম পালন করেছেন, এবং বুঝেছেন সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মই ইসলামের আল্লাহ্। শোনা যায়, তিনি একজন খাঁটি মুসলমানের মতো নামাজ প্রভৃতি পালন করেছেন। এইভাবে পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করেছেন, যত মত

তত পথ। ডাইনে বামে সামনে পিছনে যেখানেই তাকাও না কেন সেই একই ঈশ্বর।

সর্বধর্ম সম্বন্ধে এই যে ধারণা—এ ধারণা ইতিপূর্বে খুব কম মহাপুরুষই পৃথিবীতে দিয়েছেন। আবার শুধু দেওয়া নয়, জীবনে অনুশীলন ও উপলব্ধি। এইখানেই রামকৃষ্ণদেবের জীবনের সার্থকতা। আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ স্বীকার করলে পৃথিবী থেকে ধর্ম-সঙ্কট দূর হয়ে যাবে। একের আদর্শে সকলেই উজ্জীবিত হবে। উড়োজাহাজে মানুষ বহু উপরে যায়—হাজার হাজার ফুট উপরে। সেখান থেকে যখন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে দেখে সব এক। কোথাও ভেদাভেদ নেই সব এক। 'গীতা'য় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন। তাঁর মুখ-গহ্বরে অর্জুন দেখলেন কোটি কোটি নক্ষত্র—কোটি কোটি গ্রহ-তারা বিরাজমান। তখন অর্জুনের ঈশ্বরের উপলব্ধি হল। যে কোন ভাবেই হোক যতদিন বিরাটের উপলব্ধি না হবে ততদিন কোন মানুষেরই ঈশ্বরলাভ হবে না। ঈশ্বরের কল্পনা মানে বিরাটের কল্পনা। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ধ্বংস—এসব ঈশ্বরের মধ্যে নাই। কবির ভাষায় বলব : "যেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ, না থাকে সেথায় কলহ, না থাকে বিবাদ।" সব ধর্মের মধ্যে সেই পরম এককেই আবিষ্কার করা যায়। আজকের যুগে সেই আবিষ্কারের উদার মহৎ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন।

আমরা কথায় কথায় 'বিশ্ব' শব্দটা ব্যবহার করি। বিশ্ব কথাটা যখনই বলব তখনই সব ক্ষুদ্রতা, সব বাধা ব্যবধান, সব বৈসাদৃশ্য মন থেকে দূর করে দেবার কথা ভাবতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যে অপরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূলকথা হল—সব মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান। সেখানে তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে ঐক্য কাম্য। তিনি বলেছিলেন : "প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লেখা হোক 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'। " ফরাসী জাতি liberty, equality, fraternity-র দাবি ঘোষণা করেছিল—কিন্তু তা তারা স্থাপন করতে

পারেনি। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের বাণী নিয়ে বহু যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তিনি সে-বাণীকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। যুদ্ধের দ্বারা বিশ্বমানবের মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেই মৈত্রীর জন্য প্রেম চাই, সব মানুষকে এক করবার সাধনা চাই।

আজকের যুগে আন্তর্জাতিক প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার কথা প্রচার করা দরকার। আজ বিভিন্ন দেশে অনেক মহান মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছেন যাঁরা ধর্মবিরোধ দূর করে সব মানুষকে এক হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই উদার ধর্মবোধের কথাই বলেছিলেন। তাই দেশের মানুষকে আহ্বান করি তাঁর সেই বিখ্যাত উদার ঘোষণা 'যত মত তত পথ'কে গ্রহণ করে মন্ত্রের মতো তার সাধনা করতে। যদি এই উদার মত গ্রহণ না করে মধ্যযুগের সেই ধর্মযুদ্ধের কথাই ভেবে থাকি তবে মানবজাতির সমূহ ক্ষতি হবে, সব মানুষকে এক করার সাধনা ব্যর্থ হবে। ভবিষ্যতের মানুষ যখন দেখবেন ভারতের একজন সাধক, মানুষকে এক হওয়ার পথ দেখিয়েছেন তখন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে সেই সাধককে অভিনন্দন জানাবেন। মুক্তকণ্ঠে তাঁরা বলবেন : ''হে মহাসাধক, 'যত মত তত পথ' এই বাণী প্রচার করে তুমি জগতের মহৎ উপকার করেছ—তোমাকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।''

উৎস : *উদ্বোধন*, আশ্বিন, ১৩৯৫।

ক্রুশে, ক্যান্সারে কোনও ভেদ নেই

সন্তোষকুমার ঘোষ

তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা, এই সাহসও জোগাচ্ছেন তিনি। তাছাড়া নজির তো আছেই : গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী। ক্রিস্টোফার ইশারউডও যেখানে সুনিবিড় শান্তির নীড় পেয়ে যান, সেই অক্ষয় বটতলে, কী এমন পাপ করেছি যে স্নিগ্ধ এতটুকু ছায়া পাব না? পাপীজন-শরণ প্রভু উৎসাহের উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছেনই, শুধু চাই দেখার শক্তি, আর এগিয়ে যাওয়ার বেপরোয়া স্পর্ধা।

নুনের পুঁটুলি ডুবে যাবে, জানি। সমগ্র সমুদ্রকে কে কবে দৃষ্টিপটে আঁকতে পেরেছে? তবু এক আঁজলা জল বোধহয় তুলে আনা অসম্ভব নয়। সেও সাগরই! তার স্পর্শ, তার স্বাদ। যেমন পাহাড়ও। তার শ্যামল শরীরে কত আরণ্যক জীবনের আনাগোনা। তাদের নিয়ে খেলায়, সস্নেহ প্রশ্রয়দানে সে বালকোপম। যদি সে অগ্নিগিরি, তবে শিখর ফুঁড়ে কখনও লাভাস্রোত ছুটতেও পারে, যেন উন্মাদের প্রায়। নতুবা স্থির, নীল, নিমীল ধ্যানমৌন, সমাধিস্থ, আত্মসমাহিত। সব রূপ মিলিয়েই পর্বত, যেমন বিশ্বরূপ মিলিয়েই তিনি।

সাধ্য কি এই আলেখ্য আঁকি! আমাদের সম্বল তো প্রধানতঃ 'কথামৃত', বস্তুতঃ একমাত্র প্রামাণিক খনি। প্রামাণিক কেন? না, শ্রীশ্রীমা নিঃসংশয় নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে। সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ, বিশেষতঃ স্বামীজী 'শাবাস' বলছেন, এই কারণে। নতুবা না শর্টহ্যান্ড, না টেপরেকর্ডার, তথাপি উত্তরকাল শ্রীম'র অলৌকিক ধী আর স্মৃতির কাছে কৃতজ্ঞতার দায়বদ্ধ হয়ে আছে কি সাধে? কী অবতার, কী প্রেরিত পুরুষ, জগৎ জুড়ে ঐ এক ধারা। তাঁদের স্বহস্তের লিপি কদাচিৎ মেলে। কোনও মথি কিংবা

লুক পরে প্রচার করবেন, তবে আমরা সুসমাচার পাব। বুদ্ধবাণী প্রভৃতি সম্পর্কেও একই রীতি। এমন কি 'গীতা' শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উবাচ হতে পারে, কিন্তু তা লিখিত হয়েছে অন্য হাতে। 'কথামৃত' বিষয়ে একটুখানি খেদ, এটি মোটে শেষ কয়টি বছরের বাণী যে! তাও আবার মুষ্টিমেয় কিছুদিনের। কোথায় গেল তাঁর কামারপুকুরের বাল্যলীলা, কিংবা দক্ষিণেশ্বরের আর্ত সেই সব সন্ধ্যা যখন তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে ''তোরা কোথায়, আসবি না? আর কবে? আয়, আয়, আয়'' বলে অন্তর্ভেদী আকুল আহ্বান জানাতেন? 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর পাত্রে তার অল্পই রক্ষিত-সঞ্চিত মাত্র।

তবুও ওঁরাও এলেন। একে একে। কেশব সেন প্রমুখ যে কিছু লিখেছিলেন, সেটা ঐতিহাসিক অমোঘতা। তারপর বিস্ময়কর সেই দৃশ্য, সেই সংঘটন, যার বর্ণনায় পরাস্ত হয়ে শব্দের জাদুকর ইশারউডকেও একটিমাত্র অনচ্ছ কথায় ব্যাপারটা ব্যক্ত করতে হল; ফিনোমেনন। তাঁর দর্শন নিয়ে বাচালতা করব না। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতা-দ্বৈতবাদ ইত্যাদি গুরুপাক বিতর্ক পরিহারই শ্রেয়, হেতু এসব প্রসঙ্গে বাগ্‌বিস্তার আমার সাধ্যাতীত। ও কাজ, অধিকারীদের জন্য তোলা থাক। যিনি এই সাকারবাদী, এই নিরাকারে আত্মস্থ, তাঁকে তর্কচূড়ামণিদের আখড়ায় টেনে এনে কাজ কি, বিভোল অঙ্গে যে হায় বসনখানিও থাকবে না। বরং সব পথ এসে মিলে গেছে শেযে যাঁর করুণাকমল নয়নে সেই আত্মভোলা ভুবনমোহন রূপখানি খানিক দেখি। হাততালি দিয়ে যিনি গান গাইছেন, গান শুনেছেনও। যিনি সাধক, তিনি সঙ্গীতশিল্পীও। এক অঙ্গে এত?

এ বড় অবাক ব্যাপার, তখনকার কলকাতার চোস্ত ইংরেজীনবিশেরা বেদান্তের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের খিচুড়ি গোছের খানা পাকিয়েও বিজাতীয় ঢল ঠেকাতে পারছেন না। অথচ এক পূজারী ব্রাহ্মণ (অলৌকিক বিচারে অর্ধশিক্ষিত বললেই হয়, কারণ তাঁর পুঁজিপাটা তো লোককথা, লোকগাথা, কিংবদন্তী আর অল্পস্বল্প শাস্ত্র আর মন্ত্রের শ্রুতি) কিনা অবলীলায় সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করেন, বিশাল বাঁধ তৈরি হয়ে যায় তাঁর উত্তর-সাধকদের হাতে। এও একটা কীর্তি। আমাদের বোধের অগম্য। যেমন অবোধ জীবজন্তু যখন জঙ্গল ঠেলে নিজের ওষধির শিকড়টি খুঁজে আনে, আমরা বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাই না, বলি 'ইনট্যুইশন'। মানবেতর

প্রাণীরা যেমন, মানবের অধিক মানবেরাও তেমনই স্বকীয় অলৌকিক শক্তিতে অনায়াসে এমন সব কূট প্রশ্ন প্রাঞ্জল করে দেন, যা সাধারণ মাপের বিদ্যাবুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের পক্ষে বিস্ময়। পণ্ডিতেরা তলিয়ে যান, অথচ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পার হয়ে যান তাঁরা, যাঁরা মহাপ্রাণ। দিব্যজ্ঞানে আমাদের জন্যে নিপুণ নির্ভুল ছন্দে যেন 'সহজ পাঠ' তৈরি করে দেন। এই নিরিখে বিচার করলে কিছুটা যদি বোঝা যায় রামকৃষ্ণদেবকে। আধুনিক বিজ্ঞানও কি এমন ধ্বনির কথা বলে না যা শ্রুতিপার অথবা সেই অতিবেগুনি বা লাল-উজানি আলোর কথা, যা দৃষ্টিপার? দর্শন থাক, বরং তাঁর আর-এক আশ্চর্য দানের কথা বলা যাক। পশ্চিমবঙ্গের বিনষ্টপ্রায় ইডিয়ম তাঁর সমকালীন বা পরকালীন কোনও সাহিত্য রথী-মহারথীর দ্বারা রক্ষিত হল না, যা আছে তা ওই গ্রামীণ সাধকটির 'কথামৃতে'ই আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর স্বভাবী উপমা আর সরল কবিত্বশক্তিও স্মরণ করি। শুধু 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নয়, তাঁর জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকেও দেশ-বিদেশের প্রণামের সঙ্গে তাঁর স্বকীয় প্রণামটিকেও টেনে আনতে হয়। পরমাশ্চর্য আর কাকে বলে? এই প্রণাম, বলা বাহুল্য, ধর্মমতকে নয়, কর্মধারাকে। এই কর্ম অর্থাৎ সেবা শিক্ষা ইত্যাদি তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার। স্বামীজীর নেতৃত্বে শিষ্যবৃন্দ যে দায়ভাগ অঙ্গীকৃত করে নেন। আমার কেমন মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠাকুরের জীবদ্দশায় নরেন্দ্র ছিলেন, রাজা নাটকের যেন সুদর্শনা (কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যাকুল সংলাপ স্মরণীয়) আর রাখাল মহারাজ বা শরৎ মহারাজ, এরা কেউ ঠাকুরদা, কেউ বা সুরঙ্গমা। বিনা প্রশ্নে প্রণিপাত, সমর্পণ, গ্রহণ। আর, সব কিছুর মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক সূত্রবন্ধনের মতো শ্রীশ্রীমা। নতুবা এই মিশন এমন মিশন হত না। তিনিই ধাত্রী, তিনিই প্রেরণা। ঠাকুর, মা, নিবেদিতা, ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজী—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু রচনার সাধ এই অক্ষম লেখকের অনেক দিনের। প্রেম-ভালবাসার একটা গলিপথই চিনে এসেছি, অকপটে কবুল করি। ঐ 'পঞ্চকের' সম্পর্ক নিয়ে পরিপ্লুত কিছু লিখতে পারলে ভালবাসা শব্দটাই একটা ব্যাপ্ত আয়তনে, বোধে বোধে ছড়িয়ে যেত। কিন্তু রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গড়া বুঝি আর হল না। প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলেছি আধ্যাত্মিকতা এই নিবন্ধের অঙ্গ

না। জানি ভক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসে পাপবোধ থেকে, ভয় থেকে, লোভ থেকে। আন্তরিক আভ্যন্তর আবেগ থেকেও। সেই জটিল গহন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাদের কাছেই ফিরে যাই না কেন—ঠাকুর, আর শ্রীশ্রীমা। গিয়ে কি করব? জপ, তপ, উপাসনা, প্রার্থনা? ওসব সকলের নয়, সবার আসে না। ‘‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’’, বড় ছোট ভিক্ষা চাওয়া, বিশেষ করে তাঁর কাছে, বিভূতি-টিভূতি প্রদর্শনে যাঁর রুচি ছিল না, নরেন্দ্রকে এক-আধবার দেখিয়ে থাকবেন। তাঁর মহিমা অন্যত্র। অন্ততঃ এইটুকু জানি বলেই কিছুকাল বলতাম ‘‘বড় কর, ভাল কর, শান্তি দাও’’ বিশেষ করে মায়ের কাছে। ইদানীং তাও বলি না। ‘‘তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর’’ এইমাত্র বলে ক্ষান্তি দিই। খারাপ করলেও তিনিই করবেন, ভাল করলেও তিনি। আমাকে এবার নাও বলতেও দ্বিধা বোধ করি, কারণ নিতে হলে তিনিই নেবেন, রাখতে হলে রাখবেন তিনি।

আসলে কথাটা বোধহয় এই, পাড়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আছেনই। দরকার হলে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলবেন বৈকি। এইটুকুর নাম বিশ্বাস। আবার আমাদেরও হাত তুলে হাবুডুবু খেতে খেতে যেতে হবে তাঁর কাছে। ওইটুকু কর্ম, কর্তব্য, ব্যস। তিনি পূর্ণ অবতার কিনা বিচারের প্রয়োজন তো নেই। মানবিক মানদণ্ডে মেপে বড় বিস্ময় লাগে যখন দেখি সামান্যতম অহমিকাও তো তাঁর ছিল না। যিনি প্রকৃতই বড়, তাঁর থাকে না। মানের বালাইটুকু ছিল না, তাই নিজেই যান বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, দেবেন্দ্রনাথের কাছে। কী কটাক্ষ, কী সৌজন্য, কিছুই তাঁকে স্পর্শমাত্র করে না। এই পথেই এগোতে এগোতে তাঁর শেষ প্রহরের অসহনীয় শারীর যন্ত্রণারও একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। মহান্ত পুরুষেরা এইভাবেই সাধারণ মানুষের জীবন বহনের দুর্বহতা ভাগ করে নেন। যেমন প্রেমে তেমনই ক্লেশকষ্ট ভোগে এক হয়ে যান। দ্বাপরে কার্য সমাপনের পরে ক্লান্ত আত্মা ডেকে আনে গোপনচারী ব্যাধকে। তার বাণে, ক্রুশে কিংবা ক্যান্সারে কোনও ভেদ থাকে না, কারণ পার্থিব মরণ তখন তুচ্ছ। অপার্থিব লোকে প্রয়াণে, স্মরণে-বরণে তাঁরা চিরায়মান।

উৎস : *উদ্বোধন*, আশ্বিন, ১৩৯৫।

রামকৃষ্ণ-সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা

নিশীথরঞ্জন রায়

গদাধরের (১৮৩৬-১৮৮৬) বাল্য এবং কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল পল্লীর শান্ত পরিবেশে। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত পরিবেশ। সেই অঞ্চলে বহিরাগত বলতে বোঝাত তীর্থযাত্রীর দল, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজী, ফকির-দরবেশ, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা আর কথকতার গায়ক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্ত্রী-বিয়োগের (১৮৪৯) পর একদিকে মানসিক সন্তাপ, অপরদিকে সংসার চালনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন—এই দুটি কথা ভেবে রামকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্যে কামারপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায় (১৮৫০)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর সেই সময় গ্রামেই থেকে গেলেন। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যখন অগ্রজকে জানালেন যে, পড়াশুনার দিকে গদাধরের তেমন ঝোঁক নেই তখন রামকুমার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ঝামাপুকুরে (১৮৫৩)। একটানা প্রায় সতের বছর গ্রামীণ আবহাওয়ায় কাটিয়ে গদাধর পদার্পণ করলেন কলকাতায়।

কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে—অজ পাড়াগাঁ থেকে রাজধানী শহরে। গদাধর চতুষ্পাঠী আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করবেন, আর সেই সঙ্গে টোলে পাঠাভ্যাসও করবেন—এই ছিল কনিষ্ঠের কাছে রামকুমারের প্রত্যাশা। কিন্তু তা পূরণের কোন লক্ষণ নেই। আতপতণ্ডুল, কাঁচকলা আর ফলমূলের ছাঁদা বাঁধার উপযোগী বিদ্যার প্রতি গদাধরের অনীহা যথাপূর্বম্। সুতরাং পরিবেশ নতুন হলেও, ঝামাপুকুর তাঁর জীবনে রচনা করতে পারেনি কোন নতুন অধ্যায়। নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হলো আরো পরে।

গদাধরের ঝামাপুকুর বাস শুরু হবার তিন বছর পর (১৮৫৫) জানবাজারের স্বনামধন্যা রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করলেন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে জগৎ-বিখ্যাত কালীমন্দির। রামকুমারের উপর ন্যস্ত হলো নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যথাবিহিত পূজার্চনার দায়িত্ব। রামকুমার এই দায়িত্বভার গ্রহণ করায় গদাধর ঝামাপুকুর ছেড়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই বসবাস শুরু করলেন এখানেই তাঁর দিব্যজীবনের প্রকাশ। এক বছর পরে রামকুমার লোকান্তরিত হলে একুশ বছর বয়সে গদাধর গ্রহণ করলেন ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব (১৮৫৭)। এখানেই ঘটে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে গদাধরের সাধক-জীবনের উত্তরণ। ক্রমে তাঁর ঈশ্বরভক্তি আর জীবপ্রেমের খ্যাতি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের আর একটি আকর্ষণের বিষয়বস্তু হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাবাসী বহু গণ্যমান্যব্যক্তি।

রামকুমারের দেহত্যাগের বছরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সূচনা। বিদ্রোহ দমনের শেষে ইংরেজ-প্রভুত্ব আরও জাঁকাল হয়ে দেখা দিল। ততদিন প্রায় গোটা দেশ জুড়ে ইংল্যাণ্ডের সার্বভৌম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী। কলকাতা-লণ্ডনের পরেই যার স্থান। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের নরনারী; তাছাড়া ছিল বিদেশাগত বহু নরনারী।

সেদিনকার কলকাতার বাঙালীসমাজের কৃষ্টি নতুন স্রোতে বইতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের তিন দশক থেকে ইংরেজী চালচলনের অন্ধ অনুকরণের যে প্রবল ঢেউ বাঙালী-মানসিকতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল তা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। বাঙালী আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে যে সংঘাত একদিন কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজকে পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত করেছিল তাদের মধ্যেও ফিরে এসেছিল সমঝোতা। সমাজজীবন থেকে অনাচার অসাম্য দূর করার যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন, সেই আন্দোলন তখনো গতিসম্পন্ন ছিল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

নেতৃত্বে সমাজসংস্কারকামী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও ছিল গতিশীল; যদিও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন নরমপন্থী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে নরমপন্থীদের নেতৃত্বের দুর্গে ফাটল ধরতে দেখা যায়।

একদিকে বহু সাধনপদ্ধতির অনুশীলন, অপরদিকে নিজের অন্তর্নিহিত অপার্থিব ঐশ্বর্য অবলম্বন করে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে গদাধরের যখন রূপান্তর ঘটছে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে তখন কলকাতার বৌদ্ধিক-জীবনের চেহারাটি একটি স্থিরচিত্রে পর্যবসিত হয়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রাবল্য। কিছুটা আশাভঙ্গ, আবার সেই সঙ্গে নতুন আশার আলো। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে অগ্রগতি। প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীলতার চিরকালীন দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসার, ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য। পুঁজিবাদীদের প্রাধান্য। শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, সামাজিক জীবনে সংস্কার-আন্দোলনের সীমিত সাফল্য। সর্বোপরি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে একদিকে অশিক্ষা, অপরদিকে দারিদ্র্যের ভয়াবহ প্রসার—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের তিন দশক থেকে শুরু করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই সময়-সীমাটিতে কলকাতার জীবনে নানা বিষয়ে আদর্শগত বিরোধ এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যে চিরকালীন সংঘাত কলকাতার সমাজজীবনে সৃষ্টি করেছিল একদিকে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, অন্যদিকে সেই অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের উপায়-সন্ধান।

সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের দ্বন্দ্ব আর অস্থিরতার চিত্রটিই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 'ইংরেজ-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই কথাটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে সে-যুগে কিছু কিছু দাবি-দাওয়া অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইসব দাবি-দাওয়ার মধ্যে উগ্রতা ছিল না। তখনো বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের সরকার ভারতীয়দের কিছু কিছু অধিকার মেনে নিতে অসম্মত হবে না। এই অবস্থায় ভারতীয় জনগণের দৃষ্টির বেশির ভাগ দখল করে নিয়েছিল ধর্ম, সংস্কৃতি এবং

সমাজবিষয়ক সমস্যা এবং তাদের সমাধানের প্রশ্ন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার জোরদার করতে গিয়ে মিশনারী সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। রামমোহন স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রবর্তনের প্রয়াসী না হলেও পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা তাঁদের ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলে হিন্দুধর্মের ঐক্য কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত করেছিলেন। ইসলামধর্মের অনুগামীরাও ক্রমশঃ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছিলেন। আবার হিন্দুধর্মের প্রবক্তারাও জনসমক্ষে যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যেও ছিল নানা অসঙ্গতি এবং পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। বাংলার পল্লীবাসীরা এতে বিচলিত হননি, তাঁরা নিজ নিজ বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ধরনের জীবনযাপন করছিলেন তা নিস্তরঙ্গই ছিল, অশান্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাজধানী শহর কলকাতার কথা স্বতন্ত্র। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে এখানে অজস্র প্রশ্ন, বহু বাদবিতণ্ডা, তর্কযুদ্ধ, পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা। সব মিলিয়ে এখানে দেখা দিয়েছিল দ্বন্দ্ববিদীর্ণ এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর-বাসের প্রথম ক'টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল কঠোর অধ্যাত্ম-সাধনায়। তখন তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল মন্দিরে সমাগত দর্শনার্থী আর রম্‌তা সাধুসন্তদের মধ্যে। বাইরের জগতের সম্পর্ক তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। আত্মানুসন্ধান আর ঈশ্বর-উপলব্ধির দুশ্চর সাধনায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর বাহ্যজ্ঞান অনেক সময় লোপ পেয়ে যেত। ক্রমে দর্শনার্থীরা শুধু বিগ্রহ দর্শনেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তাদের দৃষ্টি ক্রমে আকৃষ্ট হলো ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ, আত্মপর অভেদ-দৃষ্টি, সহজ সরল ভাষার উপদেশামৃত-বিতরণকারী এই আত্মভোলা, নিরভিমানী সাধক-প্রবরের প্রতি। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে পরিণতি লাভ করলেন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী—ভক্তরূপে। ক্রমে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃততর হতে লাগল। কলকাতা থেকে আগত দর্শনকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকে আসতেন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন নিয়ে, কেউ আসতেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর লাভের উদ্দেশ্যে, পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্যও কেউ কেউ খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতেন

তাঁদের ব্যাকুলতা সর্বত্যাগী এই অবতারপুরুষের কাছে। তাঁর দর্শনে মনের দুঃখভার দূর হবে, লাভ করবেন অপার্থিব শান্তি—এমনি বিশ্বাসও তাঁদের পৌঁছে দিত মন্দির অঙ্গনে। রকমারী দর্শনার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের ভিড় লেগে থাকত তাঁর ঐ ঘরটিতে।

এই সময়কার কলকাতার সমাজজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী অর্ধ শতকের তুলনায় ছয় থেকে আট দশকের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানীর আদি যুগে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রথমে স্বাধীন ব্যবসায়ী, পরে কোম্পানীর কোলাবরেটর (Collaborator)। সেই সময়কার কলকাতার সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাজা নবকৃষ্ণের মতো অব্রাহ্মণও সেদিন ছিলেন সমাজপতি অথবা দলপতি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সমাজচিত্র ভিন্নতর হতে থাকে। ততদিনে বড় মাপের ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে অনেকেই জমিদারির মালিক হয়ে নিশ্চিন্ততর জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকেছেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বাড়ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ ও যুবকরা উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল বেশি মাত্রায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উত্থান কলকাতার সমসাময়িক সমাজজীবনে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষদের ক্রমবর্ধমান ভিড় এখানকার জনসমাজের চেহারা দ্রুতগতিতে পাল্টে দিতে শুরু করেছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্রসমাজ—বহুভাষাভাষী মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। ধর্মাচরণের দিক থেকে এদের মধ্যে ছিল লক্ষণীয় মাত্রায় বৈচিত্র্য। একই নগরের অধিবাসী—এই পরিচয়টুকুই ছিল তাদের পরস্পরকে এক সূত্রে ধরে রাখার উপাদান, এক কথায় Urban বা শহুরে মানসিকতা। তবু তাদের সমস্যা ছিল। জন-বিস্ফোরণের সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত নাগরিক জীবনের উপযোগী স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অপ্রতুলতা, প্রগতিবাদী বনাম রক্ষণশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, নানা ধরনের সামাজিক অনাচার আর সর্বোপরি

ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার হিন্দুধর্মের মধ্যে আচারসর্বস্বতা এবং একাধিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের বিভিন্নতা সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি করে চলেছিল বিভ্রান্তি এবং অসহিষ্ণুতা। সমাজ-সংস্কারবাদীদের মধ্যেও ছিল মতের বিভিন্নতা। এই অনভিপ্রেত পরিবেশের অবসান ঘটানোর জন্য রামমোহন চেয়েছিলেন পৌত্তলিকতার অবসান। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের বিধি-বিধানকে কঠোরতর করে তুলতে। এমনি অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের দিব্যজ্ঞানের অধিকারী সাধকপ্রবর শোনালেন অভয়বাণী। সাধারণ মানুষের মনে তখন বিভ্রান্তির অন্ত নেই। "কস্মৈ দেবায়?"—এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাচ্ছিলেন না তাঁরা। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করেছিলেন তাঁরাও যেমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজনরাও ঘটাতে পারছিলেন না তাদের সংশয়ের অবসান।

কলকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথায় ফিরে আসি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হবার পর ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিছু কিছু অধিকার দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের প্রবেশ অধিকার অব্যাহত ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের জাতিবৈরের সহজ শিকার ছিল ভারতীয় প্রজারা। শোষণ আর অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল নিরর্থক। অথচ ইংরেজদের সার্বভৌম আধিপত্য বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এ সবই ছিল অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র—কোথাও ছিল না, স্বাচ্ছন্দ্যবোধের লেশমাত্র সুযোগ।

কলকাতা শহরের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। কিন্তু যতটুকু ইতিহাস আমরা জেনেছি তাতে বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে এখানকার শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত 'হোয়াইট টাউন'। ইংরেজী সূত্রে দিশী পাড়ার বিবরণ প্রায় অনুপস্থিত। ইংরেজ-বাসিন্দাদের পরেই কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ছিলেন second class citizens। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের

মধ্যে ছিল তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রতিবেদনে এই শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। এই গণনায় কলকাতার নাগরিকদের তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে স্থান লাভ করেছেন ৭, ২৮ এবং ৪০ জন শহরবাসী। এই তালিকা দেখে মনে হয় যে, বংশগৌরব অপেক্ষা কাঞ্চনগৌরবই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিয়ন্তা। প্রথম শ্রেণীর সাত জনের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন রাজবল্লভ, নন্দকুমার-পুত্র গুরুদাস—এঁদের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা প্রায় সকলেই ছিলেন কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্যের তল্পি-বাহক, সাহেব আদমীদের দেওয়ান হিসাবে হোমরাচোমরা। তৃতীয় শ্রেণী বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল হয় কোম্পানীর মাঝামাঝি স্তরের কর্মচারী কিংবা অর্থশালী ব্যবসায়ী রূপে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনটি তালিকারই—বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মনেতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন কোম্পানীর অনুগৃহীত অথবা স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয় পরিবার যাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ অধিকতর স্বীকৃতি পেতে থাকে। তাঁরা সরকারী চাকুরিসূত্রে অথবা চিকিৎসক, আইনজীবী এবং মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শুরু করেন।

রামকৃষ্ণদেবের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখনও কলকাতায় সমাজজীবনে এই ধারাটিই অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় কলকাতা থেকে যাঁরা তাঁর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অধরলাল সেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক এবং 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'র লেখক অক্ষয়কুমার সেন, নাট্যাচার্য

এবং বহু নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষকপ্রবর 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র লেখক স্বনামধন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'মাষ্টার' নামে পরিচিত।) অভিজাত জমিদারবংশের সন্তান পরম বৈষ্ণব বলরাম বসু, সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের করণিক মনোমোহন মিত্র, চিকিৎসক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-এর লেখক রামচন্দ্র দত্ত। ঠাকুরের 'রসদ্দার' হিসাবে পরিচিত রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস—প্রমুখ বিচিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁরা গ্রথিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি অহেতুকী ভক্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পিতপ্রাণ আর যেসব গৃহীশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'সাধু নাগমহাশয়' নামে সুপরিচিত দুর্গাচরণ নাগ, গায়ক নীলকণ্ঠ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবগোপাল ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষ, প্রমথনাথ কর, শম্ভুচরণ মল্লিক, চুনীলাল বসু, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ভাই ভূপতি, কিশোরীমোহন রায়, অ্যাটর্নি দীননাথ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীলেখক শশিভূষণ ঘোষ, মহিম চক্রবর্তী, জয়গোপাল সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবং সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র লেখক ছিলেন—"ঠাকুরের ভক্তরা অসংখ্য— তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব।"

কলকাতার সে-যুগের বনেদী পরিবারের অধিকাংশই বসবাস করতেন উত্তর কলকাতায়—পুরনো আমলের সুতানুটি অঞ্চলে। বাগবাজার, বেলগাছিয়া, শ্যামপুকুর, চিৎপুর, কুমারটুলি, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, আহিরীটোলা, শ্যামপুকুর, শোভাবাজার, পোস্তা, সিঁদুরিয়াপট্টি, বৌবাজার, তালতলা, সিমলা, ঝামাপুকুর, কাঁকুড়গাছি, বাদুড়বাগান —এসব অঞ্চলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত গতি। এছাড়া ছিল দক্ষিণ কলিকাতায় কালীঘাট, ভবানীপুরে গৌরী মা-র মাতুলালয় এবং বেলতলায় মধুসূদন ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাছাড়া ছিল চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়ামসহ গড়ের মাঠ। ঠাকুর যেমন ভক্তদের টানতেন দুর্বার শক্তিতে তেমনি ভক্তরাও আকর্ষণ করতেন ঠাকুরকে।

এদের অনেকের বাড়িতেই ঠাকুর যেতেন। তাছাড়া সেদিনকার কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে দূরত্ব রচনার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মাইকেল মধুসূদন—এঁরা সকলেই ছিলেন ঠাকুরের দর্শনধন্য।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরমহংসদেবের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর উপর স্থাপন করেছিলেন অচলা ভক্তি তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরিণতি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর ত্যাগী শিষ্যরূপে। তাঁদের কেউ কেউ জন্মেছিলেন শহর কলকাতায়, কেউ কেউ শহরতলীতে। এঁদের অনেকেরই বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশে।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে—একদিকে ঠাকুরের অধ্যাত্মসাধনা এবং সেই সাধনার উপলব্ধ ফল বিতরণের প্রচারধর্মিতার অভাব সত্ত্বেও তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা, অপরদিকে কলকাতা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু আলোচিত রেনেসাঁস আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক বলে গণ্য হতে পারে। সামগ্রিক বিচারে রামকৃষ্ণদেবের গুরুত্ব এবং প্রভাব শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন জীবন সার্থকতার সন্ধান। আবার আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতি-সচেতনতা আমাদের একশ্রেণীর কলকাতাবাসীর মনে যে ধারণাটিকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল তা অন্ধ গোঁড়ামির নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য এই দুটি—বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার সাধু প্রচেষ্টাও এই যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতারা। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন, জনমানসে তা ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তা ততটুকু গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। হয়তো বা হিন্দুধর্মের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা

জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারেননি। কলকাতায় যখন পরস্পর-বিরোধী এইসব শক্তির মধ্যে সংঘাত চলছিল তখনই আবির্ভাব ঘটল রামকৃষ্ণদেবের। সব ক'টি প্রধান ধর্মের বিধিবিধান তিনি নিজে আচরণ করলেন, এই পরম সত্যটিই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, "যত মত, তত পথ।" সব ধর্মমতের লক্ষ্যই ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং যে আচরণবিধি মেনেই তাঁর উপাসনা করা হোক না কেন, লক্ষ্য এবং উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয়। জনগণের কাছে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যটিকে তুলে ধরলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে, সহজবোধ্য ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করতেন জটিল ধর্মতত্ত্ব যার সারবত্তা অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ঈশ্বরোপলব্ধির এই সাধনার ক্ষেত্র ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত প্রসারিত—এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজসেবার আদর্শ—জীব ও শিবের মধ্যে অভিন্নতা, অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা। তাঁর মতবাদের মধ্যে এই কারণেই কলকাতার তৎকালীন চিন্তানায়করা খুঁজে পেলেন প্রকৃত পথের নির্দেশ। রামকৃষ্ণদেব প্রচারিত সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সে-যুগের যাবতীয় প্রশ্ন আর সংশয় সমাধানের নির্ভুল ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেল।

উনিশ আর বিশ—এই দুই শতকের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আলোড়ন এবং আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঠাকুর ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যাত্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশ যেখানেই হতো, সেখানেই ঘটতো জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এমনি ঘটতে দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে। এঁদের প্রত্যেকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তবু ইতিহাসের বিচারে মহাবীর, বুদ্ধ, নানক এবং চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল তা তুলনাহীন। এঁরা প্রত্যেকেই পর্যটনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরের অধিবাসীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লোকশিক্ষাদাতার ভূমিকায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সাড়ে তিনশো বছর পরে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি প্রচারধর্মী ছিলেন না; পর্যটনের পথটিকেও তিনি বেছে নেননি।

তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল এমনই একটি স্থান যেখানে মিলিত হয়েছিল গোটা দেশের বিভিন্ন মানুষের প্রতিনিধিবর্গ এবং যা ছিল উনিশ-বিশ শতকের যাবতীয় চিন্তা এবং কর্মধারার উৎস। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঠাকুরের বাণী যাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছিল সেই তদানীন্তন কলকাতার শিক্ষিত মানুষ এবং যে স্থানটি ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র—কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর এবং মূল কলকাতা—ফসল উৎপাদনের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত অনুকূল।

উৎস : *উদ্বোধন*, ভাদ্র, ১৩৯৬।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শন

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের পুনর্জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি মানবমুক্তির মন্ত্র ও সমন্বয়ের বাণী কণ্ঠে নিয়ে ধরার ধুলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারী বাংলার এক অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগষ্ট * সীমিত সংখ্যক শিষ্য ও অনুরাগীর শোকাশ্রুর মধ্য দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহাবসান। তাঁর জীবনসীমা মাত্র পঞ্চাশ বছরের। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা তথা ভারতের সমাজে ও ধর্মে নতুন ভাবের যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তার শীর্ষবিন্দুতে শ্রীরামকৃষ্ণ আজও ভাস্বর। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনার জবাবে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ব্রাহ্মসমাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশে যে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে, তার সার্থক পরিণতি ও বাস্তব রূপায়ণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই। বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হলেও বিখ্যাত শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে ব্রাহ্মসমাজ—বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের

---

* স্বামী প্রভানন্দ তাঁর "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ('বিশ্ববাণী' কার্তিক, ১৩৯২) শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সঠিক তারিখ কোনটি (১৫ বা ১৬ আগষ্ট ১৮৮৬) তা নির্ধারণের জন্য অনেক তথ্য পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সকল ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা নিঃসংশয় যে শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী মতে ১৬ আগষ্ট রাত ১টা থেকে ১টা ৬ মিনিটের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

নেতৃত্বে—ক্রমশঃ খ্রীষ্টিয়ানী-ঘেঁষা সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে ও বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সত্তরের দশকে বাংলায় জাতীয়তাবাদের যে বিশেষ স্ফুরণ হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রাণবন্ত করে তোলেন। হারানো আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল জাতীয়তাবাদের মধ্যে। তৎকালীন আর্যসমাজ (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় বৈদিক পণ্ডিত, সংস্কৃতে ও বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের উপর তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। শুদ্ধি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে তিনি হিন্দুসমাজের জন্য নতুন মেয়াদ সংগ্রহ করেছিলেন। 'আক্রমণাত্মক হিন্দুধর্ম' (Aggressive Hinduism) তাঁর সময়ে জন্ম নেয়। হীনম্মন্যতার মোহ থেকে দেশবাসীর মনকে মুক্ত করতে তিনি ছিলেন ব্রতবদ্ধ। তৎকালে আর একটি আন্দোলন আমাদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। সেটা হল থিওজফিষ্ট আন্দোলন। কিন্তু ঐ আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় অতীত কীর্তিকাহিনীর জয়গান ছিল মাত্রাতিরিক্ত এবং রক্ষণশীলতার প্রবণতাও এতে ছিল স্পষ্ট। এই আন্দোলনগুলি আসলে ছিল ধর্মীয় আবরণে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন। ইংরেজী শিক্ষিত নব-আলোকপ্রাপ্ত যৌবনের দল হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা যেমন বর্জন করতে চেয়েছিল, তেমন চেয়েছিল খ্রীষ্টিয়ানী-ঘেঁষা ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম বা দয়ানন্দের আর্যসমাজ-ধর্ম কোনটাই প্রবক্তার গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে জন্ম নেয়নি। আর এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্যতা নিয়ে স্বমহিমায় আবির্ভূত হলেন।[১] তাঁর উদার বাণীর মধ্যে, তার চেয়েও বড় কথা তাঁর জীবনের মধ্যে, শিক্ষিত সন্দিগ্ধবাদী তরুণদের দল তাদের ধর্মীয় সন্দেহ ও প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে

১. *The Growth of Nationalism in India*, Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Presidency Library, Calcutta, 1957, pp. 69-72.

যৌবনের দল সমাগত হল তারা রক্ষণশীল সমাজের ও ধর্মের অনুরাগী ছিল না, তাদের অনুরাগ ছিল উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদভিত্তিক নতুন সমাজ ও ধর্মের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম ও মানবতাবাদের (humanism-এর) সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এই নবীনীকৃত হিন্দুধর্ম কাউকে বর্জন করে না, জাতিভেদ মানে না, সকলকে আপনার বুকে গ্রহণ করে। এই মানবতাবাদের মোদ্দা কথা মানুষের সেবা, নরনারায়ণের পূজা। এ চিন্তা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আধ্যাত্মিকতার নিরেট বনিয়াদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতামুখী মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি ও উদ্গাতা। জন্মের আভিজাত্য বা শিক্ষার কৌলিন্য তাঁর ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনি সমাজনেতা বা কেশবচন্দ্র সেনের মতো তিনি বাগ্মীও ছিলেন না। দয়ানন্দ সরস্বতীর পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সত্যকার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন উপলব্ধির মানুষ। নিজের উপলব্ধি থেকেই তিনি কথা বলতেন। তাই সেগুলি ধর্মপিপাসু মানুষের মনের দরজায় এমন ঘা দিত।[২] তাঁর সংস্পর্শে নাস্তিকও আস্তিক হয়ে পড়েছিল।

দক্ষিণেশ্বরে সাধনপর্ব

প্রায় নিরক্ষর কিন্তু অধ্যাত্মভাবে ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রাণা নারী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজারী হিসাবে নিযুক্ত হন। মৃন্ময়ী ভবতারিণী তাঁর কাছে ছিল চিন্ময়ী মাতৃরূপিণী। তিনি নতুন করে প্রমাণ করলেন সাধকের সাধনাই মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে রূপান্তরিত করে। ভগবৎ-দর্শনের নেশা তাঁকে পাগল করে তোলে। মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ীরূপে পাবার জন্য ঐ বছর থেকে (১৮৫৫) তাঁর যে কঠোর ও নিরলস সাধনার সূত্রপাত, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সে সাধনায় তাঁর পরিপূর্ণ সিদ্ধি। কখনও শাক্ত মতে, কখনও শৈব মতে, কখনও বৈষ্ণব মতে, কখনও বেদান্ত মতে, কখনও মুসলমানধর্ম মতে, আবার কখনও

২. *Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance*, Swami Nirvedananda, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1938, pp. A-16.

খ্রীষ্টমতে তিনি ধর্মসাধনায় নিমগ্ন হলেন। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী অনুসরণ করে তিনি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মের পথ আলাদা আলাদা হলেও সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন—ব্রহ্মানুভূতি (God-realization)।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনা নতুন কিছু নয়। সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের ঋষিদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—জগতের চরম সত্তা এক, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে তা বর্ণনা করে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় আরও স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন যে, সকল পন্থাই তাঁর কাছে পৌঁছাবার পথ-বিশেষ।[৩] খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেন—যে ধর্মের মূলমন্ত্র হল "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ"—সেই ধর্মের অষ্টমার্গ নৈতিক উন্নয়নের, অহং বুদ্ধিনাশের ও চিত্তশুদ্ধির সার্বজনিক ও শাশ্বত বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে যে ভক্তি আন্দোলন প্রবল তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি করেছিল—যার পুরোভাগে ছিলেন নামদেব, রামানন্দ, রামানুজ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ব্যক্তি[৪]—তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরের মানুষকে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—ঐক্য ও সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সমন্বয় সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রখ্যাত মনীষী বিনয় সরকার ধর্মের প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় পূজারী বলে চিহ্নিত করেছেন। বই-পড়া বিদ্যা দিয়ে নয়, গভীর আত্মোপলব্ধির শক্তিতে তিনি ঘোষণা করলেন "যত মত তত পথ।" এই মহামন্ত্রের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-সাধনার শেষ পর্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিজের বিবাহিতা পত্নীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে যোড়শীরূপে পূজা করলেন এবং পূজাসমাপ্তে মহাভাবাপ্লুত ঠাকুর মাতৃরূপিণী

৩. *Great Saviours of the World* গ্রন্থে (Swami Abhedananda, Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta) সন্নিবিষ্ট Krishna and His Teachings অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. *Creative India*, Benoy Kumar Sarkar, Motilal Banarasi Dass, Lahore, 1937, pp. 339-42.

ষোড়শীর পদপ্রান্তে তাঁর সাধন-ভজনের সমস্ত অর্ঘ্য, এমন কি নিজের সত্তাকেও নিঃশেষে নিবেদন করলেন।[৫] নিজের পত্নীকে দেহজ্ঞান-বর্জিত অবস্থায় মাতৃরূপে পূজা করার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় দ্বিতীয় আর নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "...সর্বগুণবিভূষিতা স্বীয় পত্নী সারদা দেবীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নারী মাত্রেই ছিল তাঁহার চোখে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্নীকে দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমেই গুরুত্বে বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চাসন প্রদানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই।"[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে মহীয়সী নারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই গুরুত্বে বরণ করেছিলেন তিনি হলেন তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধা ভৈরবী ব্রাহ্মণী; নাম ছিল যোগেশ্বরী। যশোহর জেলার কোনও এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট প্রায় দু-বছর ধরে তন্ত্রসাধনা শিক্ষালাভ করেন ও সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমাবধি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শাস্ত্র-বর্ণিত 'মহাভাবের' বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী বৈষ্ণবচরণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী গৌরীকান্ত অল্পদিন পরেই সত্য বলে ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, "ভৈরবী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মহিমা ঘোষণা করিলেন, বস্তুতঃ তখনই হইতেই ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর অদ্ভুত সেবকের নাম লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে বহু সাধুসন্ত ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ঐ সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে আরম্ভ করেন।"[৭]

---

৫. *The Ramakrishna Movement*, Swami Budhananda, Advaita Ashrama, Calcutta, 1980, p.1.

৬. 'মেগাফোন' কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত ৭৮ আর. পি. এম. ডিস্কে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী অভেদানন্দজীর ভাষণ দ্রষ্টব্য।

৭. *শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত*, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০২।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ধর্মচিন্তায় ও ধর্ম-সাধনায় বহুত্ব নিষ্ঠার পূজারী। মানবমনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে তিনি সন্দেহ বা ভীতির চোখে দেখতেন না। সকল মানুষ তো সাধনার সমস্তরে অবস্থিত নয়। স্তরভেদে মানুষে মানুষে ধর্ম-সাধনা-প্রণালী আলাদা আলাদা হবেই। মানুষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল বলেই সকলের ধর্মসাধনা তিনি এক ছাঁচে ঢালতে চাননি। আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রতিটি মানুষকে তিনি ধর্মসাধনায় অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার স্থান তাঁর জীবনদর্শনে ছিল না। কোন মানুষকে—সে অভিজাত হোক্ বা পণ্ডিত হোক্, ধনী হোক্ বা নির্ধন হোক্, হিন্দু হোক্ বা মুসলমান হোক্ বা খ্রীষ্টান হোক্—যেমন তিনি অবহেলা করেননি, তেমন তিনি অনাদর করেননি ধর্মসাধনার কোন পথকে। [৮] মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব তার জাগরণের জন্য সকল ধর্মপন্থাই সত্য। বেদনাহত, নৈরাশ্য-কবলিত মানুষকে তিনি শোনালেন বেদান্তের অভয় মন্ত্র আর তার ললাটে পরিয়ে দিলেন অমৃতস্য পুত্রের জয়তিলক। এই উদারতার জন্ম তাঁর আত্ম-সমাহিত ভাবোপলব্ধি থেকে। মানবমনের বৈচিত্র্যশীল গড়নের প্রতি তাঁর অফুরান শ্রদ্ধাই তাঁর প্রচারিত ধর্মকে করেছে বিশ্বজনীন। সাম্প্রদায়িক যে-কোন ধর্ম থেকে এ-বস্তু স্বতন্ত্র। মানবতাবাদ-এর বৈশিষ্ট্য। শিবজ্ঞানে জীবসেবা এ ধর্মের প্রাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কঁৎ (Auguste Comte) পাশ্চাত্য-দেশে যে 'পজিটিভিজম্' (positivism) দর্শন প্রচার করেন [৯]—যার সারমর্ম মানবতাবাদ, লোকহিত ও সমাজসেবা—তা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন আলাদা। কঁৎ সমাজসেবার দর্শন প্রচার করেছিলেন ধর্মের আদর্শ হিসাবে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দর্শন

৮. *The Religions of the World*, Vol. I, 1938, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, pp. 112-13.

৯. শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে', ২য় খণ্ড, ১৯৪৫, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা ৪৫, পৃ. ৬৪।

প্রচার করলেন চরম আত্মোপলব্ধির আবশ্যকীয় সোপান হিসাবে। কঁতের মেজাজ সংসারনিষ্ঠ মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ; শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ভাবধারায় আপ্লুত। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ কোঠা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবসেবার ধর্ম প্রচার করেন। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর মন্ত্রগুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনয় সরকার 'বৈঠকে' বলেছেন, 'বিবেকানন্দ'র দরিদ্র-নারায়ণ-পূজায় কঁৎ-অমর হয়ে রয়েছে।[১০] বর্তমানে লেখকের বিচারে বিবেকানন্দ কঁৎ-দর্শনের দ্বারা কিঞ্চিৎ-কিছু প্রভাবিত হলেও তাঁর দরিদ্র-নারায়ণ তত্ত্বের মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতায়।

উৎস : *উদ্বোধন*, ফাল্গুন, ১৩৯৩।

---

১০. ঐ, পৃ. ৬৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

‘‘কলিকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিয়ালের উৎপাত ছিল। এমনকি রাতে আমাদের উপরের ঘরে গিয়া তক্তপোষের নিচে থেকে হাঁড়ি চুরি করিয়া লইয়া পলাইত। হাঁড়ি মাথায় করিয়া দু-পায়ে তাকে ধরিয়া বেশ সতর্কে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইত। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া যাইত। কখনো কখনো ছোট ছেলেকেও লইয়া যাইত। ভাদ্র মাসে হন্যে শিয়াল হইত এবং দু-একজনকে কামড়াইয়াছে প্রায় শোনা যাইত।

‘‘কলিকাতার চারদিকে নালা, পগার ও নর্দমা ছিল এবং চারিদিকে বাঁশঝাড়, কেলে হাঁড়ি ও আবর্জনা পড়িয়া থাকিত। গর্মিকালে বিশেষতঃ আমাদের সময় মাছি খাইয়া প্রায় বমি হইত...’’

বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি।

এরও বছর পঁচিশ আগে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে একদিন কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন সতের বছরের তরুণ গদাধর। অবশ্য তাঁর কাছে এই কলকাতাই তখন রীতিমত আধুনিক শহর।[১] কলকাতা তখন আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, তরজা ছেড়ে থিয়েটারের পথে এগিয়ে চলেছে। এই পথটা প্রথম দেখিয়েছিল ইংরেজরাই। তাদের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শ্বেতাঙ্গশাসকদের চিত্তবিনোদনের জন্য লালবাজারে ‘দি প্লে হাউস’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘প্লে হাউস’কে অনুসরণ করে ‘দ্য নিউ

---

১. মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর শৈশব বলতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়স অনুমান করে নিতে পারা যায়। সুতরাং ১৮৭৭ বা তার পরবর্তী কালের বর্ণনা বলেই মনে করা যেতে পারে।

প্লে হাউস' অথবা 'দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার' নামে আরও একটি ইংরেজী মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। এসব মঞ্চ পুরোপুরি ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত। শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে অভিনয় করত, অভিনীত হতো ইংরেজী নাটক এবং দর্শকরাও কেবলমাত্র ইংরেজ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গির একটি বাড়িতে শ্রীমতী ব্রিস্টো প্রাইভেট থিয়েটার খুলে অভিনয় শুরু করেন। তিনি প্রথম ইংরেজ-ললনা যিনি কলকাতার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মঞ্চে প্রথম বাঙলা নাটক অভিনয়ের কৃতিত্বও একজন বিদেশীর। ইনি রুশ দেশীয় পর্যটক হেরাশিম লেবেডফ। কলকাতার ডোমতলায় মঞ্চ বেঁধে ইনি এম. জডরেলের 'দ্য ডিসগাইজ'-এর বাঙলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় করান। এতে কিন্তু মেয়েরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সম্ভবতঃ ঝুমুর, যাত্রাদল থেকে এইসব অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজে কিছু কিছু ইংরেজী নাটক অভিনীত হতে থাকে। ক্রমশঃ কলকাতার বাবু-শ্রেণীও নাট্যসচেতন হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উদ্যোগে ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তাঁদের বাড়িতে বাঁধা মঞ্চে অভিনীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বছর কলকাতায় পদার্পণ করেন (১৮৫৩) সেই বছরই ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের স্কুলগৃহে মঞ্চ তৈরি করে শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চের নাম হয় ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। এই ষষ্ঠ দশকেই একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী, রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার। 'নাট্যশালা' বা 'রঙ্গমঞ্চ' নাম হলেও এগুলি কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কোন বিশেষ ধনী ব্যক্তির উৎসাহে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় দু-একটি নাটক অভিনীত হতো। নাটক সম্পর্কে উৎসাহ জেগেছে অথচ অভিনয় করার উপযোগী নাটক নেই —খাঁটি নাট্যকারেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কেউ কেউ নাটকরচনায় পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতেন। এই ষষ্ঠ দশকেই কুড়িগ্রামের জমিদার কালীচরণ

রায়চৌধুরী ঘোষিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলতে গেলে, এই সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। রামনারায়ণ এরপর আরও কয়েকখানি নাটক লেখেন তাঁর 'রত্নাবলী' নাটকটি যখন বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো তখন শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের সুবিধার্থে বাবুদের আত্মীয় বন্ধুরাই তখন দর্শনের অধিকার লাভ করতেন এবং স্বভাবতই বন্ধুদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কম ছিল না। ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার রচনার জন্য একজন ইংরেজী অনুবাদকের প্রয়োজন হয়। রাজাদের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর সংক্ষিপ্তসার অনুবাদের ভার দেওয়া হয়। তিনি নাটকটি পড়ে রীতিমত হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন একরকম চ্যালেঞ্জ নিয়েই স্বয়ং বাঙলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত—সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেই তিনি নাটক লিখতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং সেই প্রথম পাশ্চাত্য রীতিতে মৌলিক বাঙলা পৌরাণিক নাটক রচিত হলো 'শর্মিষ্ঠা'। পরপর তিনটি নাটক (*শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী* ও *কৃষ্ণকুমারী*) ও দুটি প্রহসন (*একেই কি বলে সভ্যতা* ও *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*) লিখে মধুসূদন বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে কালান্তর আনলেন। সপ্তম দশকের গোড়াতেই আবির্ভাব শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের। একে একে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নাটক দেখার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু তাদের সে সুযোগ তখনো আসেনি। ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ব্যবস্থাপকরা কিছু কিছু সাধারণ দর্শককে নাটক দেখার অধিকার দেবার কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। প্রথম দিকে এই দর্শনের অধিকার লাভ করার জন্য পূর্বাহ্ণে নিজের যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে ব্যবস্থাপকদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হতো। দরখাস্তের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র যোগ করতে হতো যাতে দরখাস্তকারীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ব্যবস্থাপকরা আবেদনকারীদের গুণাগুণ বিচার করে কিছু লোককে নির্বাচিত করে

তাদের অনুমতি-পত্র দিতেন। সে পত্র পাওয়া তখনকার দিনে এতখানি গৌরবজনক ছিল যে, তাঁরা এইরকম অনুমতি-পত্র পেয়ে প্রত্যেক লোককে দেখিয়ে বেড়াতেন এবং কিভাবে সেটি লাভ করেছেন তার কাহিনী শোনাতেন।

সাধারণ দর্শকের এই দুঃখমোচন হলো ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায়। এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার একটা পটভূমিকা আছে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বাগবাজারে একটি দল তৈরি করে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের যাত্রাপালা শুরু করেন। যখন পালা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করল তখন তাঁদের থিয়েটার করার শখ হলো; কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জার জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ করা বা নিজেদের উপার্জন থেকে দান করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের চেষ্টা সহজে ফলবতী হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক নাটক—দৃশ্যপটের বাহুল্য নেই, পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ। সকলের চেষ্টায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হলো এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার সময় বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হলো। সম্প্রদায়ের নাম হলো 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। পরপর কয়েকটি অভিনয় হলো সাফল্যের সঙ্গে। 'সধবার একাদশী'র পর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (দীনবন্ধু মিত্র) অভিনয় করেও এঁরা সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রীত জনসাধারণের তাগিদে 'লীলাবতী' নাটক মঞ্চস্থ হলো এবং থিয়েটারের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হলো 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। 'লীলাবতী'র সাফল্যে উল্লসিত সম্প্রদায় টিকিট বিক্রি করে রীতিমত অভিনয় করার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এই নিয়েই মতান্তর ঘটল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রি ও নামকরণ দুটোতেই আপত্তি জানালেন। কারণ তাঁর মতে, সামান্য পুঁজিতে শ্রীহীন দৃশ্যপট ও অন্যান্য যা ব্যবস্থা করা যাবে তাতে সেই থিয়েটারকে জাতীয় নাট্যশালারূপে (ন্যাশনাল থিয়েটার) অভিহিত করা জাতীয় দৈন্য প্রকটিত করার সামিল। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এ-নিয়ে

ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শোনাও যেতে পারে আর এরই জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন হলো—টিকিটের মূল্য ২, ১ ও আট আনা। স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো পুরুষরা। ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে। মধুসূদনের ইচ্ছানুসারেই বেঙ্গল থিয়েটার নারী চরিত্রে স্ত্রীলোকের অভিনয়ের সূত্রপাত করে এবং এই শর্তেই মধুসূদন অসুস্থ অবস্থায় তাদের জন্য 'মায়াকানন' নাটক রচনা করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং বাঙলামঞ্চে স্ত্রীলোকের অভিনয় দেখে যেতে পারেননি—বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটনের আগেই ২৯ জুন ১৮৭৩ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৮৭২ থেকে যেমন সুরু হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের জয়যাত্রা, ১৮৭৩ থেকেই তেমনি বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্যোগ। সেকালে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করবেন এটা অবাস্তব কল্পনা, সুতরাং তাদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল পতিতা-শ্রেণী থেকে। সমকালীন অভিজাত শ্রেণী এ-ব্যবস্থা সুচক্ষে দেখেননি। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়েই বাঙলার থিয়েটারকে তখন এগোতে হয়েছে। সেকালে আর এক মারাত্মক ব্যাধি ছিল দলাদলি! এক ন্যাশনাল থিয়েটারই ভেঙেছে বেশ কয়েকবার। এর সঙ্গে থিয়েটারের অর্থ জোগানদারদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালও সংযুক্ত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পথ অমসৃণ করে তুলেছিল।

২

বর্তমানকালের বিলাসবহুল, সুসজ্জিত, সুমার্জিত থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে বসে সেকালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কোন ধারণা করা যাবে না। তখন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কলকাতাতেই নেই। রাস্তায় রেড়ির তেলের আলো জ্বলে—থিয়েটারের গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত। আবহসৃষ্টির অনুকূল কোন ব্যবস্থাই নেই। স্থির মঞ্চ—প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলে দৃশ্যপট পাল্টাতে হয়। অভিনয় রীতি ছিল বিশিষ্ট শিল্পিকেন্দ্রিক এবং

উচ্চগ্রামে বাঁধা। শব্দ প্রক্ষেপণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে সব শিল্পীকেই কণ্ঠের উপর নির্ভর করতে হতো। দর্শক শ্রেণীর রুচি তখনও যাত্রাপালায় অভ্যস্ত। সুতরাং ঢালাও নাচগান এবং স্থূল ভাঁড়ামি ছাড়া থিয়েটার জমত না। তখন কলকাতায় জনসংখ্যা কম, তদুপরি অভিনেত্রীদের যোগদানের ফলে একটি শ্রেণী থিয়েটার থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় সেকালের মঞ্চ-সফল নাটকেরও একটানা ২০/২৫টির বেশি অভিনয় হতো না। মঞ্চের প্রতি বিতৃষ্ণা খানিকটা কমে গিয়েছিল ১৮৮৪-তে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের পর। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ধর্মীয় জগতের মানুষের যাতায়াতে থিয়েটার কিছুটা কৌলীন্য লাভ করে।

থিয়েটার হতো শনিবার ও রবিবার অথবা বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে। রাত ন'টায় সুরু হয়ে ছ-সাত ঘণ্টা অভিনয় চলত। কর্পোরেশনের নতুই আইনে যখন রাত্রি একটার পর অভিনয় নিষিদ্ধ হলো তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের রীতিমত মাথায় হাত। প্রতিবাদের ঝড় উঠল কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ কিছু হয়নি। সত্যই চার ঘণ্টায় থিয়েটার শেষ করা তখনকার কালে দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাত আটটার আগে অভিনয় আরম্ভ করারও প্রশ্ন নেই, কারণ যে ক্ষুদ্র দর্শকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে তবে থিয়েটারে আসার ফুরসৎ পেতেন। তাছাড়া মেয়েরা তাঁদের রান্নাবান্না প্রভৃতি কাজকর্ম সেরে আহারের পাট চুকিয়ে তবেই থিয়েটারে আসার সুযোগ পেতেন। মেয়েদের বসার ব্যবস্থা ছিল দোতলায় চিকের আড়ালে। তাঁদের সঙ্গে আনীত শিশুদের শয়নের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রাখতে হতো—রাখতে হতো শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত পরিচারিকা। রাত ১২টার পর থিয়েটার শেষ হলে যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি—তারও সংখ্যা সামান্য। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় যারা থিয়েটার দেখতে আসত তারা শেষ অঙ্কের মাঝামাঝি সময়েই উঠে পড়ত। দোতলার পরিচারিকাকে খবর দিলে সে মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করত 'অমুক জায়গার অমুক বাড়ির মেয়েরা উঠে এস—তোমাদের বাড়ির লোক ডাকছে।' একবার

এইরকম সংবাদ পেয়ে এক মহিলা শিশুকক্ষে গিয়ে নিজের শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্বামীর (বা বাড়ির লোকের) সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই থিয়েটার ভাঙতে অন্য এক মহিলার আর্তনাদ, কান্নাকাটি। সেই মহিলার শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি শিশু তখনো অবশিষ্ট আছে বটে এবং সেই মহিলার সন্তানটির মতোই তাকে দেখতে, কিন্তু তার গলায় রয়েছে একটা মাদুলি—যা তাঁর ছেলের ছিল না। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন—তাঁরা গিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করারও চেষ্টা করতে লাগলেন—ভুল করে যে ছেলে নিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। এইভাবে প্রায় একঘণ্টা কাটল—থিয়েটারের কেউ বাড়ি যেতে পারছে না—স্বামী ভদ্রলোকও ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। এমন সময় বহুদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। অবশেষে সত্যই সেই ঘোড়ার গাড়িতে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এলেন—তাঁর কোলে একটি শিশু। উভয় মহিলা অশ্রুভারাক্রান্ত হাসিমুখ স-মাদুলি ও নির্মাদুলি শিশু বিনিময় করলেন। কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তখনকার শিল্পীরা বেতনভোগী হলেও তাদের বেতন ছিল আজকের তুলনায় হাস্যকর। ভ্রাম্যমাণ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের এক ধরনের হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠত। একবার থিয়েটার শেষে দেখা গেল বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে—দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাঁদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অর্ধেন্দু মুস্তাফি মুখে মুখে নাটক তৈরি করে ফেললেন এবং নাচ গান সবমিলিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। বৃষ্টি থামল—নাটকও শেষ হলো।

৩

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বাবু-থিয়েটারে গিয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তখন তাঁর সাধনার কাল—তাঁর পরিচয়ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। সুতরাং যেখানে কেবলমাত্র বাবুদের বিশিষ্ট

বন্ধুবান্ধবদেরই নিমন্ত্রণ হতো সেখানে তাঁর উপস্থিতি ঘটেনি বলেই মনে হয়। ১৮৭২-এ যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুরু হয়েছে এবং তাঁর খ্যাতিও ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে, ভক্ত সমাগমও আরম্ভ হয়েছে তখনই একমাত্র তাঁর থিয়েটারে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু সেটাও ঘটেছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বারো বছর পরে। তার আগে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে কেশবচন্দ্রের 'লিলি কটেজে' ধর্মমূলক নাটক 'নব-বৃন্দাবনে'র অপেশাদারী মঞ্চাভিনয় দেখেন। এখানে নরেন্দ্রনাথও অভিনয় করেছিলেন। সম্ভবত সেটিই তাঁর প্রথম থিয়েটার দর্শন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

উৎস : *উদ্বোধন*, ভাদ্র, ১৩৯৬।

পুরনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

নির্মলকুমার রায়

সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও ধর্মচেতনার সহায়করূপে, সংবাদপত্র বা মননশীলতায় পূর্ণ দৈনিক পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকার স্থান অনস্বীকার্য। ন্যায়নিষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকৃতপক্ষে জাতির আত্ম-উন্মীলনের উৎকৃষ্ট যন্ত্র, যা যুগে যুগে মানবসভ্যতার মহাযজ্ঞে সতত পূজারী। আনন্দের কথা, পরাধীন ভারতের সেই পুরনো দিনগুলি থেকেই আমাদের দেশে এরকম যুগব্রত সাধনার মাধ্যমরূপে পত্র-পত্রিকার প্রচলন ছিল এবং আজও তার ধারা প্রবহমান। এ-বিষয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকা একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি পাননি; কারণ, দক্ষিণেশ্বরে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর দৈব-পরিচিতি তখন অধিকাংশ লোকের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম তাঁর প্রবর্তিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী প্রচারে উদ্যোগী হন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রের মিলনের পর থেকেই তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং ক্রমশঃ দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট বসে। যে পত্রিকাগুলিতে তাঁর দিব্য জীবন-কাহিনী বা তাঁর উপদেশাবলী প্রথম প্রচারিত হতে থাকে, সেই সব পত্রিকাগুলি তখন ভারতের রাজধানী এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো।

কেশবচন্দ্রের 'Indian Mirror'—ইংরেজী পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মার্চ সর্বপ্রথম 'A Hindu Saint' শীর্ষক প্রতিবেদনে

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পরেই তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব'—বাঙলা পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে দীর্ঘ ও বিশদ পরিচয় প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে জানার আগ্রহ ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায়, সেই সময়ে যে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকাটি প্রকাশ করা হতো তাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নানা কথার উল্লেখ থাকত। ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ছোটদের 'সখা' পত্রিকাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁর 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল (তারিখ অনুযায়ী সাজানো) :

The Indian Mirror—28 March, 1875
ধর্মতত্ত্ব—১৪ মে, ১৮৭৫
The Indian Mirror—20 February, 1876
The Indian Mirror—16 April, 1876
The Indian Mirror—11 February, 1877
ধর্মতত্ত—২৮ জানুয়ারি, ১৮৭৮
ধর্মতত্ত—৩১ জুলাই, ১৮৭৮
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি, ১৮৭৯
ধর্মতত্ত্ব—২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯
The Indian Mirror—15 June, 1879
ধর্মতত্ত—১ অক্টোবর, ১৮৭৯
ধর্মতত্ত—১ নভেম্বর, ১৮৭৯
The Theistic Quarterly Review—
October-December, 1879
The Sunday Mirror—2 November, 1879
ধর্মতত্ত্ব—২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০
The New Dispensation—26 May, 1881

The New Dispensation—7 July, 1881
সুলভ সমাচার—৩০ জুলাই, ১৮৮১
The New Dispensation—9 September, 1881
The Indian Mirror—9 October, 1881
The New Dispensation—14 October, 1881
সুলভ সমাচার—২৯ অক্টোবর, ১৮৮১
The Indian Mirror—11 December, 1881
সুলভ সমাচার—১৭ ডিসেম্বর, ১৮৮১
The New Dispensation—8 January, 1882
The New Dispensation—26 February, 1882
ধর্মতত্ত—২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২
সুলভ সমাচাব—২৯ এপ্রিল, ১৮৮২
The New Dispensation—30 July, 1882
The New Dispensation—3 September, 1882
ধর্মতত্ত্ব—১৪ জানুয়ারি, ১৮৮৪
(৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর)
The Indian Mirror—26 July, 1884
ধর্মপ্রচারক—৬ আগস্ট, ১৮৪৪
তত্ত্বমঞ্জরী—জুলাই, ১৮৮৫
ধর্মতত্ত—২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—২৮ এপ্রিল, ১৮৮৬
পরিচারিকা—জুলাই, ১৮৮৬

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন। তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ 'পরিচারিকা', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'Indian Mirror' পত্রিকায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। এমনকি, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম শোভাযাত্রা ও দাহকার্যের যে নিখুঁত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা একটি ঐতিহাসিক দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য। দেহরক্ষার পর যেসব পত্র-পত্রিকায় তাঁর কথা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হলো :

পরিচারিকা—আগস্ট, ১৮৮৬

ধর্মতত্ত্ব—১৬ আগস্ট, ১৮৮৬
The Indian Mirror—19 August, 1886
The Indian Mirror—21 August, 1886
সুলভ সমাচার—২৭ আগস্ট, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—৩১ আগস্ট, ১৮৮৬
The Indian Mirror—10 September, 1886
ধর্মতত্ত্ব—১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬
তত্ত্বমঞ্জরী—আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—১ অক্টোবর, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি ১৮৮৭
বেদব্যাস—অক্টোবর, ১৮৮৭
বেদব্যাস—ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮
সখা—নভেম্বর, ১৮৮৮

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'সখা' পত্রিকাটি ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত হলেও ১৮৮৮ নভেম্বরের সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধটির রচয়িতা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় সংবাদগুলি তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল উদাহরণস্বরূপ কিছু এখানে উদ্ধৃত হলো।

ধর্মতত্ত্ব—১৪ মে, ১৮৭৫ : "**রামকৃষ্ণ পরমহংস**। জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিংবা একাদশ, তখন হইতে ইঁহার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল।... অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তের কথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায়, সে-সকল কথা তিনি অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন।... একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে, রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক

আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মতো একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।”

(আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙলা পত্রিকায় এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা প্রচারিত হয়।)

সুলভ সমাচার—৩০ জুলাই, ১৮৮১ : “***দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস***। পাঠকগণ উপরি-উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানী রাসমণির কালীবাটীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে। আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন।...”

ধর্মপ্রচারক—৬ আগস্ট, ১৮৮৪ : “**মহাত্মা রামকৃষ্ণ**।... মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস’ নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস।... তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণ-প্রার্থীমাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী।

পরিচারিকা—আগস্ট, ১৮৮৬ : “**দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস**। এই সাধুপুরুষ এইক্ষণ আর ইহলোকে নাই। তিনি গত ৩১শে শ্রাবণ নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান

সময়ের ঘোর বিলাসিতা নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার মধ্যে ইঁহার পবিত্র জীবন মুমুক্ষু নরনারীর আশাস্থল ছিল।..."

বেদব্যাস—অক্টোবর ১৮৮৭ : "**পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস**।... রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে 'নিরক্ষর' ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন।..."

সখা—নভেম্বর, ১৮৮৮ : "আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইঁহার ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্মকথা-সকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তিসকল ঈশ্বর-সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।... অনেকের বিশ্বাস, মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী ও ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস-চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।"

কলকাতার তিনশো বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে, আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সেইসব কলকাতাবাসী গুণগ্রাহীদের, যাঁরা প্রথম পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী অপ্রতিহত অনন্ত-সত্তার সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের তৎকালীন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে।

উৎস : *উদ্বোধন*, ভাদ্র, ১৩৯৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবার্ষিকী থেকে সার্ধ শতবার্ষিকী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

তাঁর আবির্ভাব ১৮৩৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। তাঁর মহাপ্রয়াণ ১৮৮৬ সালের ১৫ অগস্ট মধ্যরাত্রিতে। (সাহেবী মতে ১৬ অগস্ট)। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী ১৯৩৬ সালে। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবার্ষিকী এই বৎসর। ১৯৮৬ সালেই।

এই চারটি বছর আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান প্রসঙ্গে।

হুগলী জেলার দেরে গ্রামের মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এমনই সত্যনিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষ যে, পরাক্রান্ত জমিদার রামানন্দ রায়ের কথাতেও মিথ্যা মামলায় সাক্ষী দিতে রাজী হননি, ফলে গ্রাম থেকে উৎখাত হন এবং নিকটবর্তী কামারপুকুর গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর আনুকূল্যে কিছু ধানজমি পেয়ে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন এবং ধর্মরক্ষা, দুইই করে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর ঢেঁকিশালে গদাধরের জন্ম। জন্মের পরেই হড়কে গড়িয়ে উনুনের ছাইয়ের মধ্যে সে শিশু চলে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনেন ধনী কামারনী।

সেদিন সেই নবজাতককে দর্শন করবার জন্য কতজন উপস্থিত ছিলেন জানি না। খুব বেশী মানুষের থাকার সম্ভাবনা ছিল না।

তারপর পঞ্চাশ বছর কেটেছে। ১৮৮৬ সালের ১৬ অগস্টের অপরাহ্নকাল। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের (এখন রামকৃষ্ণ) দেহান্ত হয়েছে। সেকালের নামী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেই খবর পেয়ে কাশীপুর বাগানবাটিতে উপস্থিত হলেন। কী দেখলেন, তার বিবরণ এইপ্রকার :

"গিয়ে দেখলাম, বাড়ির গাড়িবারান্দার সামনে ধবধবে শাদা এক শয্যায় তিনি শায়িত, এবং বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অশ্রুরুদ্ধ চোখে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে বসে আছেন। পরমহংসদেব ডানপাশে ফিরে শুয়ে; তাঁর সারা দেহে নির্বাণের অনন্ত নীরবতা ও শান্তি। শান্তি চারিদিকে—শান্তি মৌন বৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহ্ণে, উপরের নীল আকাশে এবং তার উপরে সঞ্চরমাণ খণ্ড মেঘে। মহামরণের সামনে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যখন আমরা বসে আছি, ঠিক তখনি কয়েকটি বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ল। ঠিক যেন পুষ্পবৃষ্টি, আর্য-সাহিত্যে যেকথা আমরা পড়েছি। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন যখন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ করে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই বারিবিন্দু যেন সেই স্খলিত পুষ্পপর্ণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবনকালে দর্শন করা পরম সৌভাগ্য—একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ।"

ঐ 'সৌভাগ্য' গ্রহণ করবার জন্য কত সংখ্যক মানুষ সেদিন ঐখানে উপস্থিত ছিলেন? সংখ্যা অবশ্যই বেশী নয়। ১৯ অগস্টের *ইণ্ডিয়ান মিররে* অবশ্য লেখা হয়, শ্মশানে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাত্রাকালে "বহুসংখ্যক" ভক্ত অনুগমন করেছিলেন, তবু সেই সংখ্যা যে একশো-দেড়শোর বেশী নয়, তা ধর্মতত্ত্ব পত্রিকার ৩১ অগস্ট তারিখের বিবরণ দেখলেই বোঝা যায় (সেকালে সম্ভবত ঐ সংখ্যা 'বহুসংখ্যক' বলে গৃহীত হত!) :

"১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহনগরের শবদাহ-ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে একশত-দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাটখানা বেশ সাজানো হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তিসহকারে পদধারণপূর্বক প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যানপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন—একদল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতালসহ সংকীর্তন করিয়া অগ্রে-অগ্রে গমন করেন। ...চারিজন বিধান-প্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাইয়া

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বৌদ্ধধর্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্মের অর্ধচন্দ্র, খ্রীস্টধর্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ...সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোনো-কোনো বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩-৪টি সঙ্গীত করেন। ...পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মীলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল। তাহাতে বোধহয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে।"

অগ্নিদাহের পরে অবশিষ্ট কিছু অস্থি ভক্তগণ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই অস্থির সংরক্ষণ কারা করবেন, এ সম্বন্ধে কয়েকজন সচ্ছল গৃহীভক্ত এবং সঙ্গতিহীন যুবক শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ হলেও বিজ্ঞ গৃহীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয়, ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানবাটীতে তা রক্ষিত হবে। তদনুযায়ী (*সুলভ সমাচার* পত্রিকার ২৭ অগস্টের সংবাদ)—

"গত সোমবার (২৩ অগস্ট, ১৮৮৬) প্রাতে নয়টার সময় শিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সংকীর্তনসহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্রকলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন। দলে অনুমান পঞ্চাশজন ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল-করতাল-শিঙ্গাসহ বিডন ষ্ট্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সংকীর্তনের দল, তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নবরচিত সঙ্গীত করিতে-করিতে চলিলেন। পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফুলের মালায় কলসীটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানীযোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুই দিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্বপশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত মস্তকে গমন করিতেছিলেন। শিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পঁহুছিয়া একটি ইষ্টকনির্মিত সমাধিগহ্বরে কলসীটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণপূর্বক অনেকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।"

পঞ্চাশজন ভক্তের অনুগমন, একটি উদ্যানবাটীতে অস্থিসংরক্ষণ, পরে সেখানে সাধক রামকৃষ্ণের স্মৃতিমন্দির, কিছু ভক্তের নম্রচিত্তে পরবর্তী যাতায়াত—এইভাবে ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটতে পারত। তাই

ছিল প্রত্যাশিত। 'পরমহংসের বিধবা স্ত্রীর' আবার মাসিক ভাতার কী দরকার?—তদনুযায়ী দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকে মাসিক সাত টাকা বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; তিনি স্বামীর নির্দেশের মর্যাদা রক্ষা করে, শ্বশুরের ভিটে কামারপুকরে গিয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে গিঁট দিয়ে, এবং কলমী শাকের ব্যঞ্জন দিয়ে, আহারকর্ম সমাধা করে দিন কাটাচ্ছিলেন; এবং পরমহংসের কয়েকজন 'পাগলা ছোঁড়া' শিষ্য ঘরসংসার ছেড়ে বরাহনগরে একটা পড়ো-বাড়িতে অর্ধাহার-অনাহার, অর্ধনগ্ন বা নগ্নতার অবস্থায় থেকে ধ্যান-জপ, শাস্ত্রপাঠ ও উচ্চকণ্ঠে গান ইত্যাদি সহ সময় কাটাচ্ছিলেন, কেউ কেউ আবার তারই মধ্যে তীর্থ ভ্রমণেও বেরিয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং ভবিষ্যতের কোনো ভরসাই ছিল না। পরমহংসদেবের কাছে সেকালের বিখ্যাত জ্ঞানীগুণীদের আগমন (অথবা ঐসব বিখ্যাতদের সন্দর্শনে এঁর গমন), ঘণ্টার পর ঘণ্টা সর্বোচ্চ শিক্ষিতদের এই 'অশিক্ষিত' মানুষটির কথা শুনে যাওয়া, আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ কালে এঁর বিচিত্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ—এই সকল আশ্চর্য এক ঐতিহাসিক স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে পারত। কিন্তু—কী ছিল বিধাতার মনে। পরমহংসের এক শিষ্য, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ নাম নিয়ে পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীর মনোভূখণ্ডের বেশ খানিক জায়গা অধিকার করে নিলেন, তাঁর সেই কীর্তি-কাহিনীর প্রভাব পড়ল এদেশের জনচিত্তের উপরে, তার ফলে, তখনো বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরেননি, তখনই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে, সেকালের পক্ষে বিরাট জনতা, অন্তত কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ হল। (*ইণ্ডিয়ান নেশন*, ১৯-৩-১৮৯৪)। ১৮৯৫ সালে সেই সংখ্যা আরও বাড়ল, বেড়েই চলল।

১৮৯৫ সালের ৯ অগস্ট স্বামী বিবেকানন্দ ই. টি. স্টার্ডিকে যা লিখেছিলেন, তা কিন্তু মোটেই 'বিবেকানন্দীয় উচ্ছ্বাসের' একটি নমুনা ছিল না :

''যখন আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করেছিলেন, তখন আমরা দ্বাদশজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবকমাত্র। আমাদের বিপক্ষে বহুসংখ্যক শক্তিশালী গোষ্ঠী। তারা আমাদের গোড়াতেই পিষে ফেলবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ একটি মহাসম্পদ আমাদের

দিয়ে গিয়েছিলেন—কথার মালা গেঁথে যাওয়া নয়, যথার্থ জীবনযাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং নিরন্তর সংগ্রামের শক্তি। আজ সমগ্র ভারতবর্ষ, তাঁকে জানে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর প্রচারিত সত্য দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দশ বছর আগে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে আমি একশো লোককে জোটাতে পারিনি, গত বৎসর সেখানে এসেছিল পঞ্চাশ হাজার।"

সহসা রামকৃষ্ণের বিপুল বিস্তারে আর্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উপরের চিঠির চার বৎসর পরে লেখা একটি প্রবন্ধে ('রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি') স্বামীজী মধুরভাষায় নিবেদন করেন :

"যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া ঐ মূর্খ দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে-দেশের এক মূর্খ পূজারী সপ্তসমুদ্রপার পর্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্পকালেই প্রতিধ্বনিত করিল—সেই দেশের সর্বলোকমান্য শূরবীর মহাপণ্ডিত আপনারা—আপনারা ইচ্ছা করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা—আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি—আমরা মূর্খ দরিদ্র নগণ্য বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক—"

এর ১৫ বছর পরে, জনচিত্তে বিশেষত যুবচিত্তে, রামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহের প্রভাবে আতঙ্কিত ভারতস্থ বৃটিশ সরকারের পক্ষে চার্লস টেগার্ট রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাতে দেখা যায়—রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৩৫, ব্রহ্মচারীর সংখ্যা ২৬, ব্রহ্মচারীরূপে যোগদানে ইচ্ছুকের সংখ্যা ৭। কেন্দ্রীয় বেলুড় মঠ কর্তৃক স্বীকৃত সর্বভারতীয় শাখা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০। এছাড়া 'ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা' অসংখ্য গ্রাম-আশ্রমের কথাও ঐ রিপোর্টে ছিল।

২

টেগার্ট রিপোর্টের ২২ বছর পরে, এবং ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনের ১০ বছর পরে ১৯৩৬ সালে, রামকৃষ্ণ মিশন

বৎসরব্যাপী যে শতবার্ষিকী উৎসব পালন করে, যা শেষ পর্বে ছিল কলকাতায় ধর্মমহাসভা, সেই সকল অনুষ্ঠান, বিশেষত ধর্মমহাসভা সূত্রে আন্তর্জাতিক সমাবেশ যে, তদবধি এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা, তা *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার বহুদর্শী স্থিরবুদ্ধি সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় না বলে পারেননি :

"The Sri Ramakrishna Centenary celebrations, which had been going on for a year came to a close last month in Calcutta with a Parliament of Religions. This assembly held some eight sessions. Several important addresses were delivered and erudite papers were read. The meetings were held in the Calcutta Town Hall, which was overcrowded every day with unprecendetly large gatherings. Only on one day, when the poet-sage Rabindranath Tagore delivered his presidential address, the meeting was held in the Calcutta University Institute Hall, which was full to overflowing... The assembly was attended by men and women from distant lands. Such gatherings were never before seen in Calcutta.

"The followers of Sri Ramakrishna have given evidence in the centenary celebrations of great powers of organization and of giving publicity to what they wanted the public to know." [*Modern Review*, April, 1937]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "এ ধরনের সম্মেলন কলকাতায় ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।" সতর্ক বিনয়ের সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি—যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতে নতুন আলোড়ন ঘটে গিয়ে আবার নবযুগের সূচনা না হয়, তাহলে নিকট ভবিষ্যতে এই ধরনের সম্মেলন হবার সম্ভাবনাও নেই। তার মানে নয়, দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীরা ভারতবর্ষে সমবেত হবেন না, খুবই হবেন, অনেক বড় সংখ্যায় হবেন, এটা জেট বিমানের যুগ—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বামী অভেদানন্দকে কি একসঙ্গে পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে কি মহাত্মা গান্ধীর দূত কাকা কালেলকরকে, কিংবা কবি-রাজনৈতিক

সরোজিনী নাইডু, মিস্টিক-বৈদান্তিক স্বামী পরমানন্দ, পর্বত-অভিযাত্রী ও ধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড, ঐতিহাসিক ডি. আর. ভাণ্ডারকর; শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণকে। যে সম্মেলনের সংগঠন সমিতির সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ, সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোমাঁ রোলাঁ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ এম আর জয়াকর, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, এন সি কেলকার, স্যার তেগবাহাদুর শপ্রু, স্যার জে সি বোস, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার এ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এন বি খারে, স্যার পি সি রায়, স্যার নীলরতন সরকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এ এফ রহমান, কামাক্ষী নটরাজন, স্যার মীর্জা ইসমাইল, সিলভ্যাঁ লেভি, মাধবশ্রীহরি আনে, এ কে ফজলুল হক, তৎসহ সারা ভারতের বহু মঠাধিপতি সন্ন্যাসী। এঁরা যে কমিটির সঙ্গে যুক্ত হতে রাজি হয়েছিলেন, সেটাই বিরাট সংবাদ। বহুসংখ্যক সাধারণ সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, সেই সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অনুরূপা দেবী, কাউন্ট কাইজারলিঙ, রেভাঃ জে টি সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডাঃ তারকনাথ দাশ, আনন্দ কুমারস্বামী, ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কালিদাস নাগ—এবং প্রধান সংগঠকদের অন্যতম অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। আমি এখানে তালিকাভুক্ত বহু বিখ্যাত বিদেশী মনীষীদের নাম ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি। ভারত ও পৃথিবীর বহু সেরা মানুষ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন, প্রখ্যাত বহু মনীষী প্রবন্ধ পড়েছিলেন বা পাঠিয়েছিলেন, নানা দেশের বিশিষ্ট নারী পুরুষ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন—না, তার বিবরণের মধ্যে যাচ্ছি না। সারা ভারতের অনেক জায়গায়, এবং বিশ্বের কোনো-কোনো জায়গায়, যেভাবে এই উৎসব পালিত হয়, তার কথাও

আনছি না। এখানে কেবল দুজনের ভাষণের কথা বলব। প্রথমজন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের শীর্ষপুরুষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ধর্মমহাসভার মূল সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় ও দার্শনিক ভিত্তির সুচারু বিশ্লেষণ করেছিলেন। শুরুতে তিনি বলেন :

"পঁচিশ বছরেরও আগে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে আমি একটি পেপার লিখেছিলাম, 'বিবেকানন্দের মনের ক্রমবিকাশের এক প্রাথমিক অধ্যায়।' সেই লেখার শেষে বিবেকানন্দের গুরুকে দর্শন করতে আমার যাত্রার বিবরণ দিয়েছিলাম। ঝঞ্ঝাময় সেই সন্ধ্যায় বজ্র ও বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছিল। রামকৃষ্ণকে দর্শন আমার মনে যে-আলোড়ন এনেছিল তার উপযোগী ছিল ঐ নৈসর্গিক অবস্থা। আর এখন আমার মৃত্যু সমাসন্ন—শান্ত নির্লিপ্ত মন। এই অবস্থায় আমি সেই মানুষের শতবার্ষিকী উৎসবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যলাভ করলাম, যিনি এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে স্থান ও কালের অতীত হয়ে বিরাজ করতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে প্রতিটি ধর্মের সম্পূর্ণ আচার গ্রহণ করে সেই ধর্মের সাধনা করতেন, তার উল্লেখের পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, "তাঁর এই সকল কার্যাবলীতে কোনো ভঙ্গি ছিল না, কিংবা এগুলি কল্পনাশ্রয়ী ব্যাপারও নয়। এখানে এমন একজন আত্মবান পুরুষকে দেখা গেল যিনি ধর্মজীবন ও ইতিহাসের সকল মানবিক অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি হিন্দু ঐতিহ্যে মূল্যবান উপাদান যুক্ত করেছিলেন—মুসলমান ধর্ম থেকে নিয়েছিলেন সাম্য ও মানবভ্রাতৃত্বের বোধ, খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে পাপত্রাণের প্রয়োজনীয়তা।"

সর্বজনীন ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের বক্তব্যের আলোচনার পরে, তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য ও পার্থক্য কোথায়, শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের পথ কেন অবলম্বনীয়, তার বিষয়ে তিনি বলেন :

"What we want is not merely Universal Religion in its quintessence, as Rammohan sought it in his earlier days —not merely an eclectic religion by compounding the

distinctive essences, theoretical as well as practical of the different religions, as Keshubchandra sought it, but experience as a whole as it has unfolded itself in the history of man, and this can be realised by us, as Ramakrishna taught, by syncretic practice of Religion by being a Hindu with the Hindu, a Moslem with the Moslem, a Christian with the Christian, and Universalist with the Universalist, and all this as a stepping stone to the Ultimate Realisation of God-in-Man and Man-in-God."

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শতবার্ষিকী সভা উপলক্ষ্যে ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে আহূত এক ছাত্র সভাতেও সভাপতিত্ব করেন; তার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সভায় ডঃ শীল যা বলেন, তার মধ্যে মূল অধিবেশনে, তাঁর প্রদত্ত ভাষণের অনেক কথাই ছিল। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* ১৪-৩-৩৭ তারিখে প্রকাশিত বিবরণের একাংশ এই :

"ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে যেরূপ ধর্মের রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, বর্তমান যুগে কোনো ধর্মসাধকের জীবনে তাহা তেমন করিয়া পাওয়া যায় না।

"নিরুপাধি সাধনায় তিনি ভগবানকে গুণাতীত ও সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত স্বরূপে উপলব্ধি করিতেন। উপাধির দিক দিয়া তিনি জগন্মাতা কালীর ও তাঁহার বিভিন্ন রূপের উপাসক ছিলেন। তিনি একের মধ্যে বহুর ও বহুর মধ্যে একের উপাসনা করিতেন। তাঁহার এই উপলব্ধির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। পূর্ণকেই তিনি সকল দিকে উপলব্ধি করিতেন। এইরূপে রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনার ভিতরে নিরাকার ও সাকার উপাসনাকে এক করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, যে-আকারে যে-দেবতারই পূজা করা হউক না কেন, সকলই সেই এক ভগবানের পূজা। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে তিনি কোনো ভেদ দেখিতেন না।...

"ভারতীয় সাধকদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা অনেকেই ঐহিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। সংসারের উর্ধ্বে থাকাতে তাঁহারা সংসারসমুদ্রে

ভাসমান জীবনশ্রেণীর অপেক্ষা সংসারের কার্যকারণ পরম্পরাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। রামকৃষ্ণের বাণীসমূহ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সাংসারিক বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম ছিল। কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি লোককথা এবং কাহিনীকে মানবের অধ্যাত্মজ্ঞান ও মুক্তিসাধনায় প্রয়োগ করিতেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন, যত মত তত পথ। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই সাধনার একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। ইহাই তাঁহার হৃদয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিরূপে কার্য করিয়াছে। তাঁহার মতে সাধনাই মুখ্য বিষয়—বিশিষ্ট ধর্মমত বা পথ নহে। তদনুসারে রামকৃষ্ণদেব প্রত্যেক ধর্মমত মানিয়া চলিয়াই সাধনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন হিন্দুর নিকট হিন্দু, মুসলমানের নিকট মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ানের নিকট ক্রিশ্চিয়ান, বিশ্বপ্রেমিকের দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রেমিক। এইভাবে মুক্তি তাঁহার জীবনে সকল দিক হইতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ধর্মের যে আধুনিক রূপ বর্তমানকালে কল্পিত হইয়াছে, তাহার সহিত রামকৃষ্ণের ঐ ধর্মসাধনার পরিপূর্ণ সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই আধুনিকতা শুধু ধর্মের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, মানবজীবনের ও সভ্যতার সকল দিকেই উহার প্রসার আবশ্যক। বিভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি আজ মানবসমাজকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাকে সেই গণ্ডী হইতে মুক্তি দিতে হইবে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক—সর্বক্ষেত্রেই প্রেম ও মৈত্রীকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ধর্মসম্মেলন এই দিক হইতে মানব মহাসম্মেলনেরই সোপানস্বরূপ বলা চলে।

"পরমহংসদেবকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, ধর্মকে ধ্যান-রসের দিক হইতে দেখিতে হইবে এবং বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয়সূত্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পরমহংসদেবের এই ধ্যান-রস-সাধনা হিন্দু সাধকদিগের একটি বিশিষ্ট সাধনা। ভারতের ইতিহাসে এই সাধনার বিকাশ বিভিন্ন যুগে বিচিত্রভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই ধ্যানপরায়ণ সাধকদের চিত্তের প্রশান্তিই সাধনার লক্ষ্য : সমষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহারা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও অন্তর্জ্যোতি লাভ করিয়াছেন; সোপাধি হইতে নিরুপাধি স্তরে নিজেদের চিত্তকে

লইয়া গিয়াছেন। ভাষান্তরে, সীমার ভিতর দিয়া অসীমের উপলব্ধি করিয়াছেন।"

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের যোগদান ও ভাষণ জনচক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বলাভ করে। তার মূলে, তাঁর প্রদত্ত ভাষণের শক্তিমহিমা তো ছিলই, অধিকন্তু ছিল—তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এই ব্যাপারটি। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বের প্রধান সাংস্কৃতিক নেতাদের অন্যতম মানবতাবাদী আন্দোলনের সহায়ক, এবং অবশ্যই একালের ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। তিনি যোগদান করছেন, এর একটা বিশেষ মূল্য ছিল। আরও একটা তাৎপর্য ছিল। শিক্ষিত সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণার রূপ তখন অস্পষ্ট। এমনকি বৃহৎ এক মহলে এমন ধারণাও প্রচলিত ছিল—রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী বা অনুরাগী নন। রবীন্দ্রনাথ যোগদান করছেন রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর এক অধিবেশনের সভাপতিরূপে—এই সংবাদ সেজন্য বাড়তি আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।

ধর্মমহাসভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণই সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এর উপরে সম্পাদকীয়ও রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সম্বন্ধে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ডের শ্রদ্ধাঘন মন্তব্য সর্বত্র সমর্থনের সঙ্গে উল্লিখিত হয়। "ধর্মমহাসম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশনের সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া (আনন্দবাজার ৪ মার্চ, ১৯৩৭ লিখেছিল) স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড বলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বলিয়া মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার অন্তরাত্মা চিরসবুজ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।" স্যার ফ্রান্সিস আরও বলেছিলেন, "উদ্যোক্তারা কেবল এই একটি ভাষণের জন্য ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠানকে সার্থক বিবেচনা করতে পারেন।"

ঐদিনের অধিবেশন সম্বন্ধে *আনন্দবাজারের* প্রতিবেদন এই প্রকার : "বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়ে কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য

ইনস্টিটিউটে অত্যন্ত অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। ইনস্টিটিউটের বাহিরে রাস্তার উপর একটি লাউড স্পীকার বসানো হইয়াছিল এবং অনেকে হলে প্রবেশ করিতে না পারায় সেখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

"শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বুধবার সকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। অন্যান্য উপস্থিতগণের মধ্যে তিনি এবং সস্ত্রীক কর্নেল লিন্ডবার্গও ছিলেন। একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জিও দেল বোচ্চিও এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিন প্রাইলুস্কির শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র পঠিত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। স্বামী পরমানন্দ, স্বামী নির্বেদানন্দ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।"

অ্যাডভান্স পত্রিকা লিখেছিল (৪-৩-৩৬), "রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সুরৈশ্বর্যপূর্ণ সুললিত কণ্ঠে শান্তি ও সৌন্দর্যের বাণী উচ্চারণ করছিলেন, তখন বিশাল জনমণ্ডলী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ ভাষণের গোড়ার দিকে রহস্যময় আধ্যাত্মিক সত্যের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বস্তুবাদকে সীমাবদ্ধ বলে চিহ্নিতও করেন। যদিও তিনি বলেছিলেন, "আমি শুধু কবি, আমি ভালবাসি মানুষকে আর এই সৃষ্টিকে", তবু তারই সঙ্গে একথাও বলেন, "কিন্তু যেহেতু ভালবাসা এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি দেয়, তাই আমি মানবসমাজের গভীরের চাপা স্বর শুনতে পাই, অনুভব করি তার অন্তরাবেগের স্পন্দন। আমি সেই মানুষ নই, যে-হতভাগ্য কারাগারের মধ্যে জন্মেও তাকে কারাগার বলে অনুভব করতে পারে না।" এর পরেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চেতনার কথা এনেছিলেন। মানুষ ও জীবজগতের মধ্যে সর্বদাই মুক্তির জন্য তীব্র আকুতি। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন এক রহস্যময় জগতের কথা, যা শারীরিক দাবির দাস নয়। সে জগৎ ক্ষীণালোকিত, তবু অনিবার্য তার আকর্ষণ। সেই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটে নিঃস্বার্থ প্রেমের সূত্রে। বুদ্ধের জীবনে তার দৃষ্টান্ত আছে—সর্বজীবের

প্রতি তাঁর মৈত্রীতে। এরই পাশে রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন জড়বাদকে। জড়ের লক্ষণ তার আকারের সীমাবদ্ধতায়। ঐ সীমার অন্তর্গত স্থানের আধিপত্য নিয়েই যত সংঘর্ষ, যা ঐহিক অধিকারের মতোই ধর্মীয় অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় পরিলক্ষিত। দলভুক্তদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে ধর্মধ্বজীরা দম্ভ করে, সেই চেষ্টায় ধর্মান্তরিত করতে চায়। যে ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ নিজের আত্মাকে মুক্ত করার চিন্তা করতে পারে, সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়িয়েছে মুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। রবীন্দ্রনাথ কঠিন ভাষায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে আঘাত করে বলেন, আন্তরিক নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের নামে যে-কলঙ্ক আরোপ করতে না পারে, আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশী মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতা তাই করে থাকে। পরগাছার মতো সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের জীবনরস শোষণ করে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়, যাতে সে বুঝতেই পারে না, ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে নির্জীব কঙ্কালে। রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করেছিলেন সাহসী মানুষদের যাঁরা গতানুগতিকের প্রস্তর-প্রাচীরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। তাই বলে তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য এক ধর্ম, এক আদর্শের কথাও বলেননি। তাঁর কাছে কবিতার মতো ধর্মও নির্দিষ্ট মতবাদ নয়, তা বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ। মানুষের ব্যক্তিত্ব অনন্তের নিরবচ্ছিন্ন অকল্পনীয় বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হবে। যখন কোনো ধর্ম তার বিশেষ মতবাদকে সমগ্র মানবজাতির উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তখন তা, রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনার পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন, যাঁর বিষয়ে ক্ষুদ্র অথচ অনবদ্য কবিতায় (তার ইংরাজি ও বাংলা দুই রূপই আছে) এইকালে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই বলে যে, রামকৃষ্ণ-জীবনে ধর্মীয় সাধনার বহু মত ও পথ সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছিল। বর্তমান ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাত্মারা সত্যকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। সমগ্রের মধ্যে ঐক্যকে পরম সত্যের নানা অভিব্যক্তির তাৎপর্যকে অনুভব করার শক্তি তাঁদের আছে। কিন্তু অধিকাংশ ভক্ত-বিশ্বাসীরা মত ও পথের পার্থক্যকে

সমন্বিত করতে সমর্থ নয়। তাদের স্তিমিত সংকুচিত কল্পনা ধর্মের অনন্ত রূপের দর্শনে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ে যায়—ধর্মান্ধ ও পুরোহিতের দল তাদের নিংড়ে ব্যবহার করে চলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে। যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা এই পরিণতি স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলেন কিনা সন্দেহ।"

ভাষণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"আমাকে যখন এই বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সমক্ষে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন আমি স্বতঃই অনিচ্ছাবোধ করেছিলাম, কারণ প্রচলিত অর্থে আমাকে ধার্মিক বলা যাবে কিনা আমি জানি না। কালকৌলীন্যযুক্ত ধর্মমতসমূহে ঈশ্বরের বিশেষ-বিশেষ ভাব সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান, তার কোনো একটিতে আমার অধিকার আছে, এমন দাবি করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যদি আমি এই মর্যাদাযুক্ত কর্তব্য গ্রহণ করে থাকি, তার একমাত্র হেতু—আমি সেই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই ধর্মমহাসভা আহূত হয়েছে। পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি—কারণ তিনি ধর্মীয় নৈরাজ্যের মরু-যুগে নিজ উপলব্ধির দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন; তাঁর বিশাল সত্তা আপাত সংঘাতশীল সাধনাসমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে। তাঁকে ভক্তি করি—কারণ, তাঁর আত্মার সারল্য চিরদিনের জন্য হতমান করেছে পণ্ডিত ও পুরোহিতদের আড়ম্বর ও বিদ্যাগর্বকে।"

ধর্মমহাসভা চলা কালেই সিস্টার সরস্বতী কর্তৃক পরিচালিত রামকৃষ্ণ মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটির উদ্দেশ্যে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা বাণী প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় যে-সকল নিঃস্বার্থ সেবাকাজ নিঃশব্দে সম্পাদিত হচ্ছে, তাই বোধহয় তাঁর স্মৃতির প্রতি মহত্তম শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।"

৩

১৯৩৬ থেকে ১৯৮৬—এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে প্রধান একটি ঘটনা—১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতালাভ।

বৃহৎ বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যে, এবং ভারতের জনজীবনে, এই ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাধীনতার পরে জাতীয় প্রয়োজনে, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়। স্কুল, কলেজ ও অন্যবিধ শিক্ষার ব্যাপারে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার সর্বাগ্রণী ভূমিকা দাঁড়ায়। সমাজসেবা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও অগ্রগতি ঘটে। সভা সমিতি, পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সবিশেষ কর্মপ্রসার ঘটে। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখার সংখ্যা বেড়ে যায়, এক শাখার মধ্যে কর্মগত বহুমুখিতা দেখা যায়। রামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত অগণিত প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা 'রামকৃষ্ণ আন্দোলন' কথাটা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করতে থাকেন। ১৯১৪ সালের টেগার্ট রিপোর্টে যেখানে অবিভক্ত ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখার সংখ্যা ১১—সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৮৩-৮৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে শাখার সংখ্যা ৯২, বাংলাদেশে ১০ এবং বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে—২১। ১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হয়ে গেছে। তাতে দেশ বিদেশ থেকে আগত বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কয়েক শত 'প্রাইভেট' প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও যোগ দেন। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং যুব সংগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে কাজ শুরু করা হয়।

রামকৃষ্ণ আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। ঠিক উল্টোদিকে এই আন্দোলনের বিপরীত ভাব বিস্তৃতও হচ্ছে ভারত ও পৃথিবীতে—স্থূল জড়বাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আকার ধরে। হিংসা এবং বিচ্ছিন্নতার প্রকট আকার চতুর্দিকে। রবীন্দ্রনাথ যার বিষয়ে বলেছেন, ধর্মের সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ চেষ্টা, ধর্মান্তরকরণের দ্বারা একদিকে সেই চেষ্টা চলেছে (গান্ধীজী যে-ধর্মান্তরকরণের কঠিনতম সমালোচক ভারতবর্ষে), অন্যদিকে এখনো চলেছে একই ধর্মের একাংশ কর্তৃক অন্য অংশের উপর অত্যাচার—ধর্মের কুসংস্কার আশ্রয় করে। বৃহত্তর পৃথিবীতে দেখা যায়, বিভক্ত বিশ্বের আকাশে বিভিন্ন মতবাদী বৃহৎ শক্তির মারণাস্ত্রের পরিক্রমণ। উপায় একমাত্র রামকৃষ্ণের

আদর্শে— যত মত তত পথ। এর অর্থ নয়, অন্য মানুষের অন্যায় পথকে সমর্থন জানানো। হৃদয়ের প্রসারের ভিত্তিতে অবস্থিত না থাকলে কারো পক্ষে অপর মানুষের সঙ্গত অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করা সম্ভব হয় না।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর একটি অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী ছিলেন। সরোজিনী তাঁর অন্য সকল কাজকর্ম সত্ত্বেও মূলে কবি। তাঁর কবিকণ্ঠ ঐ সভায় মূল সত্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল সুন্দর প্রতীকী বক্তব্যে। ধর্মমহাসভায় তাঁর বার্তা কী হবে, সে প্রসঙ্গে তিনি একটি পূর্বতন ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তিনি 'কমলা লেকচার' দিচ্ছেন। বক্তৃতার শেষ দিনে সকালে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর উদ্যানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'বক্তৃতায় আজ কী বলবে, স্থির করেছ?' সরোজিনী বলেন, 'না, ঠিক করিনি।' তাঁরা উদ্যানে গাছ-পালা, পাখি, মূর্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে একটি পাথরের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মন্দির কিন্তু শূন্য। জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, 'কবি, তুমি কি তোমার বার্তা পেয়েছ?' সরোজিনী বলেন, 'হাঁ, পেয়েছি।' কোন্ বার্তা তিনি পেয়েছিলেন, তাই জানান ধর্মমহাসভায়।—"এই রয়েছে শূন্য মন্দির। মূর্তি নেই। প্রত্যেক পূজারীই এই মন্দিরে স্থাপন করতে পারবেন তাঁর সত্তার দ্বারা সৃষ্ট ঈশ্বরের মূর্তিকে। পৃথিবীর সকল মহান সাধু-সন্ত ও ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের এই হল বাণী। এই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। তাঁর কাছে মন্দির সর্বদাই শূন্য, কারণ তা সর্বদাই প্রস্তুত তাঁর দেবতাকে গ্রহণ করবার জন্য। সে দেবতার রূপ কী?—তিনি নিজেকে মুসলমানের সত্তায় স্থাপন করেছেন, কিংবা খ্রীস্টানের সত্তায়, জরথুস্টীয়, শিখ বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সত্তায়—কিছু এসে যায় না। রামকৃষ্ণ বলেছেন—এই হল মানবের মন্দির। মানবের প্রয়োজন ঈশ্বরকে। কোথায় পাব তাঁকে? আমি কি তাঁকে আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ চেতনার দ্বারা সৃষ্টি করব? কিংবা তাঁকে তাঁর বিচিত্র অনন্ত স্বরূপে আকাঙ্ক্ষা করব?"

সরোজিনী বিশেষভাবে বলতে চেয়েছিলেন, "রামকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, মন্দির শূন্য আছে কারণ কেবল ভালবাসার দ্বারাই

ঈশ্বরের প্রতিমা নির্মিত হতে পারে। ভালবাসা মানুষকে আবদ্ধ করে না, তা মানুষকে যুক্ত করে দেয় সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে—যা ঈশ্বরের উপাসনা করে নানা রূপে, নানা নামে।”

পরমহংসের বিশাল ডানার কথা বলেছেন এক পাশ্চাত্য লেখক। সেই ডানার ছায়ায় আর্ত মানুষের বিশ্রাম। ভারতীয় কবি সরোজিনী নাইডু রামকৃষ্ণের শূন্য মন্দিরের কথা বলেছেন, যার ভিতর থেকে চেতনার আহ্বান প্রসারিত হচ্ছে নিরন্তর, কে কোথায় আছো, এসো এসো, তোমাদের স্বপ্নের, কল্পনার, প্রেরণার, প্রেমের প্রতিমা নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধ শতবার্ষিকীতে সেই আহ্বান আমাদের জন্য রয়েছেই।

স্বীকৃতি : তথ্য সংগ্রহে শ্রীবিমলকুমার ঘোষ বিশেষ সাহায্য করেছেন।

উৎস : *দেশ*, ৮ মার্চ, ১৮৯৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্ম আন্দোলন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্ম আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে, প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত উল্লেখযোগ্য ধর্ম-আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক মনীষী রাজা রামমোহন রায় [১৭৭৪-১৮৩৩] ভারতে আধুনিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত হন। রামমোহন যে বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমকালীন বহু প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবিৎ, যথা সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শঙ্কর শাস্ত্রী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহনের নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হন।[১] খ্রীষ্টধর্মেও রামমোহনের ব্যুৎপত্তি এত গভীর ছিল যে শ্রীরামপুরে পাদ্রী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাঁর সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন।[২] কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রামমোহন সাধু, মহাত্মা, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ বা ভারতীয় অর্থে ধর্ম-প্রবর্তক ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলেই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রামমোহন নিজেও নানাভাবে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় হিন্দুদের সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি ও তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Translation of An Abridgement of The Vedant* বই-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে হিন্দুদের মূর্তিপূজার আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি তাদের সমাজ-বিন্যাসকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।[৩] তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, বহু দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের স্বীকৃতি হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার ও দুর্নীতির জন্য

মূলত দায়ী। মূর্তি-প্রতীকে উপাসনার প্রকৃত অর্থ হিন্দুসমাজের অতি সামান্যসংখ্যক লোকই উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করতেন, সাধারণ লোকেরা বিনা বিচারে তাই গ্রহণ করত, এবং আপন উদরপূর্তির জন্য এই পুরোহিতকুল নানা লৌকিক কুসংস্কার এবং নীতিবোধবিরহিত সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।[৪] এঁদের কার্যকলাপের ফলেই হিন্দুধর্ম এক প্রাণহীন আচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি এই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানলেও লোকাচার লঙ্ঘনের সাহস বা প্রবৃত্তি তাঁদের না। তাছাড়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথাও তাদের সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটতে দেয় নি। তাই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদেশী বন্ধুকে লেখা চিঠিতে রামমোহন বলেছেন, 'It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.'[৫] এই কারণে রামমোহন হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বেদান্ত বা উপনিষদের অনুবাদ করে তাঁর দেশবাসীকে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে [১৮২৮] শিক্ষিত হিন্দুদের নিরাকার একেশ্বর উপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেছিলেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম উপাসনায় বেদপাঠের অধিকার সম্ভবত শুধু ব্রাহ্মণদেরই ছিল[৬], কিন্তু অন্য কোনভাবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এতে স্বীকৃত হয় নি, পুরোহিতদেরও এতে কোন ভূমিকা ছিল না। ধর্ম-সংস্কারের পাশাপাশি রামমোহন সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনেও লিপ্ত হয়েছিলেন। সতীদাহ-নিরোধ এবং নানাভাবে হিন্দু সমাজে নারীর ক্লেশমোচন এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে জড়িত না হলেও রামমোহনের অনুগামীরাই ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন।[৭]

রামমোহনের যুগ হতেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই দ্বিমুখী ধারা প্রবাহিত ছিল। ধর্ম-সংস্কার ও সমাজসংস্কার দুই ব্যাপারেই ব্রাহ্মদের উৎসাহ লক্ষিত হত। তার কারণ ব্রাহ্মধর্ম ছিল মূলত সামাজিক ধর্ম,

অধ্যাত্ম-সাধনার প্রেরণা এখানে ছিল গৌণ। তবে কোন কোন ব্রাহ্ম নেতার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল, সমাজসংস্কারের চেয়েও ধর্মজীবনে উন্নতিকে তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের [১৮১৭-১৯০৫] মধ্যেই আমরা ধর্মভাবের এই বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পরবর্তী বারো বৎসরে [১৮৩১-১৮৪৩] ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোনরকমে সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কাজ চালিয়ে গেলেও খুব অল্পসংখ্যক লোকই এই উপাসনায় যোগ দিতেন, এবং যাঁরা যোগ দিতেন তাঁরাও বিশেষ ধর্মভাবে ভাবিত ছিলেন বলে মনে হয় না।[৮] দেবেন্দ্রনাথ এই অবস্থায় সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে [১৮৪৩] একে একটি সুসংবদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীর রূপ দান করেন। উপনিষদ্ হতে শ্লোক সঙ্কলন করে দুই খণ্ডে ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় [১৮৪৮-৪৯], সমাজের সভ্যদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানের অন্য পৌত্তলিকতার ভাব সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সঙ্কলিত হয়, এবং খ্রীষ্টধর্মের মতো ব্রাহ্মধর্মের বহুল প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন প্রচারকও নিয়োগ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্ম ভাবধারা প্রচারের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।[৯] সমাজ-সংস্কারের তুলনায় ব্রহ্মোপাসনাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে প্রথম দিকে তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আপন উপবীত ত্যাগ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের সকল আচার্য ও উপাচার্যই উপবীত ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১০] অনুজপ্রতিম রাজনারায়ণ বসুকে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১১] পরবর্তী কালে অবশ্য মহর্ষি সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে পড়েন, এবং ব্রাহ্মসমাজ যাতে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গণ্ডীর বাইরে চলে না যায় সে বিষয়ে যত্নবান হন।[১২]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেন [১৮৩৮-১৮৮৪] যোগদান করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সমাজের একজন সক্রিয় কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্মজীবন যাপনে এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে তাঁর গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে মহর্ষি তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্র সত্যই সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের ৫৪টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সূদূর মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবেও ব্রাহ্ম আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। [১৩] প্রথম দিকে কেশবচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারক রূপটিই বেশী প্রকটিত হয়েছিল। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে সমাজের আচার্যদের উপবীত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় [১৮৬১] এবং সমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হয় [১৮৬৪]। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় মহিলারা প্রকাশ্যে যোগ দিতে আরম্ভ করেন ও স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের বিষয়েও কেশবের অনুগামীরা উদ্যোগী হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে কেশবচন্দ্র ভারত-সংস্কার-সভা স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন এই সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত মহিলাদের জন্যই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একটি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করা হয় উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায়। [১৪] সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কেশবের অতিরিক্ত আগ্রহ কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করতে পারে নি। ফলে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, সমাজের আচার্যদের পক্ষে উপবীত ত্যাগ আবশ্যিক কিনা এই প্রশ্নে ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ও তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। [১৫] দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও কেশব ও তাঁর অনুগামীরা অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রচলন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসারের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান, এবং প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইনের (Act III of 1872) সাহায্যে অহিন্দু ও অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের দৃষ্টিতে সিদ্ধ হয়। [১৬] কৌলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহ নিবারণের ব্যাপারেও কেশবের

অনুগামীরা উদ্যোগী হন। কিন্তু ঐ সত্তরের দশকেই ধীরে ধীরে কেশবের অধ্যাত্মজীবন গভীরতা লাভ করে এবং তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের [১৮৩৬-১৮৮৬] সঙ্গে তাঁর মিলন ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়ীতে কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। [১৭] এর পূর্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখেছিলেন, এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্ম উপাসকদের মধ্যে কেশবের ধ্যানই গভীরতা লাভ করেছে। [১৮] কিন্তু সে সময় কেশবের সঙ্গে তাঁর কোন বাক্যালাপ হয় নি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিজে উদ্যোগী হয়ে কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক রূপে কেশবের খ্যাতি শুধু ভারতের সর্বত্র নয়, তার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। বাংলা দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কাছে কেশব তখন এক বিরাট আদর্শ হিসাবে বিরাজমান। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো এক অখ্যাত সাধক। যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় কিছু সাধু-সন্ন্যাসী, সনাতনপন্থী পণ্ডিত ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সংশ্লিষ্ট কিছু ভক্ত ছাড়া আর কেউই বিশেষ পান নি। [১৯] সম্পূর্ণ নিরক্ষর না হলেও কেশবের তুলনায় তাঁকে অশিক্ষিত বলা চলে, অবশ্য প্রচলিত অর্থে যে বাচনভঙ্গীতে তিনি বাক্যালাপ করতেন তা-ও অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। কিন্তু প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের চিত্ত জয় করলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগের এখানে সূচনা হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে যে শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট করেছিলেন তা হচ্ছে আসলে তাঁর অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রভাব। এই প্রভাব তিনি অর্জন করেছিলেন দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ ও সুকঠিন সাধনার মাধ্যমে [১৮৫৫-১৮৬৭], যার তুলনা পৃথিবীর যে কোন দেশ ও কালেই ছিল দুর্লভ। এই সাধনার অবসানে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা হয়েছিল যে, ঈশ্বরাবতার বা আধিকারিক পুরুষ, এবং তাঁর অদৃষ্ট-পূর্ব সাধনা আধ্যাত্মিক রাজ্যে নতুন আলোকপাত এবং জীবের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছে। [২০]

সাধনার সময় আধ্যাত্মিক রাজ্যের যে সব সত্যগুলি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেগুলি সংসারী জীবের কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন এবং সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে কেশব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমকালীন বাঙালী চিন্তানায়কদের সংস্পর্শে আসেন [২১], এবং পরে নিজের এক অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী গড়ে তোলেন, যার মধ্যে গৃহী ও ত্যাগী দুই-এর উপস্থিতিই আমরা লক্ষ্য করি [যদিও শেষোক্তরাই যে তাঁর বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই]। কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে একদিনেই এই সংযোগের অবসান হয় নি, এবং এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আরও বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন।

বেলঘরিয়ার বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনা শুনে কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও কেশবকে বলেন যে, তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের যে স্তরে পৌঁছিয়েছেন তাতে তাঁর মন ইচ্ছা করলে সংসারে থাকতে পারে, আবার তা সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে। [২২] এই প্রথম সন্দর্শনের পর কেশব তাঁর কয়েকজন অনুগামীকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য, এবং পরে তিনি নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের জন্য সদলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যেতে আরম্ভ করেন। ক্রমে উভয়ের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, একে অন্যকে কয়েকদিন দেখতে না পেলেই বিচলিত বোধ করতেন। কেশব দক্ষিণেশ্বরে না এলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কলকাতায় কেশবের বাড়ী 'কমল কুটিরে' এসে উপস্থিত হতেন। এ ছাড়া প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবের সময় কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রাহ্ম মন্দিরে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন, অথবা নিজে কয়েকজন অনুগামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বর-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করতেন। কখনো কখনো তিনি ঐ উপলক্ষ্যে সদলবলে স্টীমারে চড়ে কীর্তন করতে করতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হতেন, এবং পরমহংসদেবকে স্টীমারে তুলে নিয়ে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনতে শুনতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ

করতেন।[২৩] লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে বাগ্মী কেশব কখনো ধর্মবিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ বা নিজের ভাব প্রচারের চেষ্টা করতেন না। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্বে'র সাক্ষ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার কিছু দিন পরে (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) 'ধর্মতত্ত্ব' লিখছে, 'পরম ধার্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীত ভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিতেন। কোনদিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না।'[২৪] কেশবের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজের আরো অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও অমৃতলাল বসুর নাম বিশেষ স্মরণীয়। কেশব শুধু ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। 'সুলভ সমাচার', 'The Indian Mirror', 'Theistic Quarterly Review' প্রভৃতি পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ও উপদেশাবলী প্রকাশ করে কেশব শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের পরিচয় ঘটিয়ে দেন।[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি-সংগ্রহ প্রথম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হতেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় [জানুয়ারি, ১৮৭৮]।[২৬]

কালে কেশবের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরে। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কেশবের উৎসাহে মন্দা দেখা দেয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরেই ভারত-সংস্কার-সভার অকালমৃত্যু ঘটে এবং কেশবের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয়েরও একই পরিণাম দেখা যায়।[২৭] স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপার কেশবের মতামত কারো কারো কাছে রক্ষণশীল মনে হয়। তা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ব্যাপারে কেশব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করছেন, এই অভিযোগও শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে তুমুল ঝড় ওঠে, এবং কেশব তাঁর নিজের স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে অংশত পৌত্তলিক মতে কুচবিহারের নাবালক মহারাজার সঙ্গে নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তাঁর অনুগামীদের একাংশ তাঁকে পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে

একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন [মে, ১৮৭৮]। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই নতুন সমাজে যোগ দেন।[২৮] শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু কেশবের এই চরম সঙ্কটের দিনে তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি, বরং সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে বলেছিলেন যে, গৃহী কেশব ধর্ম লঙ্ঘন না করে কন্যার প্রতি পিতার কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র, এতে অন্যায়ের কিছু নেই।[২৯] কেশব এর পর নববিধান সমাজ স্থাপন করে নানা ধর্ম সমন্বয়ের এক অভিনব প্রচেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে এই সমাজের উপাসনাতেও যোগ দিতেন। তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে উপস্থিত হলে কেশব কখনো কখনো তাঁর উপদেশ দান বন্ধ রেখে বেদী থেকে নেমে এসে বিশিষ্ট অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতেন।[৩০] কেশবের শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন, এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেশব দেহরক্ষা করলে তিনি বলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে যেন তাঁর একটি অঙ্গ পক্ষাঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।[৩১] অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন। বিজয়কৃষ্ণ ও তার একান্ত অনুগামীরা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাকারোপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হলে শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত কমিয়ে দেন, এবং এরপর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব হতে অনেকটা মুক্ত হয়ে সমাজ-সংস্কার এবং স্বদেশসেবার কাজে প্রধানত নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। শিবনাথের শেষোক্ত আচরণ সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখেছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সদস্য নরেন্দ্রনাথ [পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ] শিবনাথকে তাঁর আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাকি বলেছিলেন যে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘনঘন যাতায়াত করলে তাঁর দেখাদেখি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্য সকলেও তাই করবে এবং পরিণামে সমাজই ভেঙ্গে যাবে।[৩২] শিবনাথ নিজে কিন্তু লিখেছেন যে, তিনি প্রধানত দুটি কারণে দক্ষিণেশ্বরে ঘনঘন যাতায়াত বন্ধ করে দেন,—প্রথম কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কিছু অভিনেতার ঘনিষ্ঠতা, যাঁদের শিবনাথ দুশ্চরিত্র বলেই মনে করতেন, এবং দ্বিতীয় কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যের তাঁর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রবণতা। [৩৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালীন ব্রাহ্ম নেতাদের কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের উপর তিনি কোন ভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কিনা, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম বুঝতে পারেন তাঁর শিক্ষিত দেশবাসীর উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবধারার প্রভাব কতটা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তিনি দেখেন যে, ব্রাহ্মসমাজের নায়কেরা অনেকেই তাঁদের জীবনে সমাজ সংস্কারকে মুখ্য এবং অধ্যাত্ম-সাধনাকে গৌণ উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। [৩৪] ধর্ম বলতে তাঁরা প্রধানত সামাজিক জীবনযাপনের আদর্শ রীতিনীতিকেই বোঝেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ছিলেন মুখ্যত সাধক, ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিকেই তিনি জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রে ছিলেন ঈশ্বর, পরিধিতে মনুষ্যসমাজ; আর ব্রাহ্মনেতাদের ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রে ছিল মনুষ্য সমাজ পরিধিতে ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জগৎ ছিল ব্রহ্মময়, আর ব্রাহ্ম নেতাদের কাছে ব্রহ্ম ছিলেন দূরস্থ আরাধ্য পুরুষ। যাই হোক, ব্রাহ্মসমাজের যে সব ব্যক্তির মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিকতা ভাবের স্ফুরণ দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি যথার্থ সাধনানুরাগ জাগ্রত করার চেষ্টা করে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলতে তাঁদের উৎসাহিত করেন। তবে তিনি জানতেন যে, তাঁর সব উপদেশ ভোগবাসনাযুক্ত ব্রাহ্মনেতাদের কাছে রুচিকর হবে না, তাঁরা সেগুলি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যা হয় বললাম, তোমরা ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে নিও।' ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনার ভাবকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কাঁচা নিরাকার' ভাব বলে বর্ণনা করতেন। ঈশ্বরকে সাকার বলে বর্ণনা করলে যেমন তাঁর উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়, নিরাকার কিন্তু সগুণ বলে বর্ণনা করলেও তেমনি তাঁর পরিপূর্ণ বর্ণনা হয় না। ঈশ্বর-স্বরূপের ইতি করতে নেই—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। ব্রাহ্মভক্তেরা উপাসনার সময় ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথাই বেশী আলোচনা

করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার পরিবর্তে তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ভাব আনতে পরামর্শ দেন, কারণ ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথা বেশী চিন্তা করলে ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরকে আপন বলে কল্পনা করা কঠিন হতে পারে। [৩৫] তবে এ সব পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মকে ঈশ্বরলাভের জন্য জগতে প্রচারিত বিভিন্ন মত ও পথের অন্যতম বলে মনে করতেন। কীর্তনের শেষে তিনি যখন ঈশ্বর ও তাঁর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তদের উদ্দেশে প্রণাম জানাতেন, তখন 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম জানাতে কখনো ভুলতেন না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কোন আন্তরিক বিরাগ বা দ্বেষ ছিল না। [৩৬] বরং ঐ সমাজের কোন কোন নেতার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় *Theistic Querterly Review* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮৭৯, পৃ. ৩২-৩৯) লিখেছেন, 'We cannot be like him. Our ideal of religious life is different, but so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God.' [৩৭] শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর *Men I Have Seen* [৩৭] পুস্তিকায় তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ভালোবাসার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কতদূর প্রভাবিত করেছিলেন তা এখন বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির ভাব এনেছিলেন, একথা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হতেই বৈষ্ণব-পদ্ধতিতে সঙ্কীর্তন করার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তখনো তাঁর পরিচয়ই হয় নি। আশৈশব শাক্ত পরিবেশে লালিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই কারণে দীর্ঘকাল কেশবের দলে যোগদান করা থেকে বিরত ছিলেন বলে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। [৩৮] ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনাও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রবর্তিত হয় নি। মহর্ষির সময় হতেই ব্রাহ্মমন্দিরে আচার্যের উপদেশে এবং সঙ্গীতে মাতৃভাবে ঈশ্বরের

আরাধনার কথা মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এইভাবে রচিত কয়েকটি ব্রাহ্ম সঙ্গীতের উল্লেখ গৌরগোবিন্দ রায়ের ‘আচার্য কেশবচন্দ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। [৩৯] কেশবের অপর এক অনুরাগী দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবার আগে কেশব তাঁর বক্তৃতায় অন্ততঃ বত্রিশবার ঈশ্বরের মাতৃভাবের উল্লেখ করেছেন। [৪০] কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কেশবের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ও নববিধান সমাজের অন্যতম নেতা গৌরগোবিন্দ রায় স্বীকার করেছেন যে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌরগোবিন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের অন্তরে যোগ, বৈরাগ্য ও ভক্তির উন্মেষে এবং তাঁর মাতৃভাবের সাধনায় বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন, যদিও দক্ষিণেশ্বরের সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই কেশবের মনে এই সব ভাবের সঞ্চার হয়েছিল। [৪১] শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্পকাল পরে [১৬/৯/১৮৮৬] কেশবের প্রতিষ্ঠিত ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকাই কিন্তু অন্যরকম মন্তব্য করে, ‘পরমহংসের জীবন হইতে ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়... পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে।’ [৪২] প্রায় একই সময় (আগষ্ট, ১৮৮৬) ‘পরিচারিকা’ পত্রিকাও লেখে, ‘ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষ রূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়।’ [৪৩] এরপর এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের মনোভাব তাঁর পরিচালিত পত্রিকাগুলিতেই সুপরিস্ফুট। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের প্রথম মিলনের ঠিক দুই মাস পরে ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকা লিখছে, ‘তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে মোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।... একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল।’ [৪৪] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি *The Indian Mirror* পত্রিকায় লেখা হয়, ‘Several Brahmo missionaries who have visited him from time to time speak highly of his devotion and purity and his

deep insight into the realities of the inner world.' [৪৫] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভাঙ্গন ধরার পর কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এর ফলে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই কেশবের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়, 'আমরা দেখিতেছি তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে। [৪৬] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন যে, কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে এতদূর ভক্তি করতেন যে তাঁকে একবার নিজের বাড়ীতে পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। [৪৭] কেশব যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তা বহু সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। [৪৮]

তবে সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সত্ত্বেও কেশব যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি, তাও সুস্পষ্টই দেখা যায়। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কেশবের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হলেও এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ দূর হলেও [৪৯] কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ আন্তরিকভাবে তাঁর জীবনে গ্রহণ করেন নি। মধ্যে মধ্যে তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে নির্দিষ্ট কালের জন্য সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সে যুগের সম্পন্ন বাঙালী গৃহস্থের জীবনযাত্রা। ১৮৮০ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই কেশব তাঁর একটি ধর্মোপদেশে বলেন, 'Some think that to touch money or to behold the face of a woman is rank sin;...It is to lay axe at the root of this mistaken opinion that the New Dispensation is born'. [৫০]

কেশব, শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উপদেশটির তাৎপর্যও ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে চললে মানুষ শেষ পর্যন্ত একই সত্যে উপনীত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা বারংবার ঘোষণা করলেও প্রতিটি ধর্মের যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে এ কথা তিনি মানতেন, এবং সেই কারণেই বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে একটি সঙ্কর ধর্ম সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। কেশবের নববিধান এই ধরনের সঙ্কর ধর্ম

সৃষ্টিরই একটি অভিনব প্রয়াস ছিল।[৫১] এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা বা সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর এই কৃত্রিম ধর্ম মহামতি আকবরের দীন-ই-ইলাহির মতোই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কেশবের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই নববিধান বিলুপ্ত হয়, এবং তার জন্য কেউই বিশেষ শোক প্রকাশ করে নি।

কেশবের অনুগামীদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণী শক্তির কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনা পড়েই মনে হয় যে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মনে যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভবত তার কিছুটা দূর করতে পেরেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন, 'He unconsciously throws a flood of marvellous light upon the obscurest corners of the Puranic Shastras, and brings out the fundamental principles of the popular Hindu faith and notions with a philosophical clearness which strangely contrasts itself with his simple and illiterate life...To him each of these [Hindu] deities is a force, an incarnated principle tending to reveal the supreme relation of the soul to that eternal and formless being who is unchangeable...'[৫২] হিন্দুদের বহু দেবদেবী পূজার তাৎপর্য যে প্রতাপচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন উপরের উদ্ধৃতিটি তারই স্বীকৃতি।

প্রথম জীবনে কেশবের অনুচর এবং পরবর্তী কালে তাঁর বিরোধী দলের অন্যতম নায়ক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের বাসনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, এবং ক্রমশ তিনি সাকার-উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এর জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঐ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের কথা বিজয়কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।[৫৩]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অপর এক স্তম্ভ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আর কোন মানুষ ধর্ম

সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কিনা জানি না...এই রূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইতেন।' [৫৪] শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি সম্বন্ধে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শিবনাথের এই ধারণার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও জানতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সাক্ষাতে এই প্রসঙ্গ তুলে একবার তাঁকে লজ্জা দিয়েছিলেন। [৫৫] তবে পরবর্তী কালে শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবসমাধির সঙ্গে চৈতন্য, হজরত মহম্মদ এবং বহু খ্রীষ্টান সাধু-সন্তদের ভাবসমাধির তুলনা করেছেন, তাঁর মতে এই ধরনের স্নায়বিক বিকার ('a strange nervous disorder') এক শ্রেণীর সাধকের মধ্যেই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ শিবনাথের কাছে আদৌ রুচিকর হয় নি, কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, সাধকমাত্র নয়। [৫৬] শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের উদারতার কথা উল্লেখ করে শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন 'ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।... রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।' [৫৭] ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য যে তাঁর অন্তরে অধ্যাত্মভাবকে দৃঢ়তর করেছিল একথাও শিবনাথ স্বীকার করেছেন, 'My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me. [৫৮] শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে [৩১/৮/১৮৮৬] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' মন্তব্য করে, 'যে সকল ধর্মাত্মা বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন।' [৫৯]

নববিধান সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালও [চিরঞ্জীব শর্মা নামেও পরিচিত] শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম দর্শন, ভাব ও সমাধি দেখেই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাবোদ্দীপক পদরচনা করেছিলেন। 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি', 'গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার', 'চিদাকাশে হল পূর্ণ

প্রেম-চন্দ্রোদয় রে', 'আমায় দে মা পাগল করে' ইত্যাদি সঙ্গীতগুলি ঐ পর্যায়ের সন্দেহ নেই। সুকণ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় সমাধিস্থ হতেন বলে জানা যায়। ৬০ এই সব নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের কথা বাদ দিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেন, সিঁথির বেণীমাধব পাল, (কলকাতার) সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, নন্দন বাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদের বাড়ীতে উৎসবের সময় এবং কখনো কখনো অন্য সময়েও যাতায়াত করতেন, তবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল জানা যায় নি। ৬১ একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। মহর্ষির সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা, আগে ভোগী, পরে যোগী—সম্ভবত তাঁদের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল। ৬২ তাছাড়া পৌত্তলিকতাকে মহর্ষি বোধ হয় কোনভাবে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ঋণী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, ব্রাহ্মনেতারা কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বরের সাধনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে'র ভাষায়, 'পরমহংসও আচার্যের [কেশবচন্দ্র] জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন।' ৬৩ যাঁরা এ ধরনের দাবী করেছিলেন তাঁরা, বলা বাহুল্য, তোতাপুরীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক ভাবে সাধনার কথা অবগত ছিলেন না। ধর্মীয় উদারতার বিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রাহ্ম-সমাজের কাছে শিক্ষণীয় কিছু ছিল না, কারণ তিনি নিজেই ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ভাব সহ আঠারোটি বিভিন্ন ভাবের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং এসবই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের অনেক আগেকার কথা। ৬৪ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদানের সময় বেশভূষার ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত সভ্যসমাজের রীতিনীতি কিছুটা মেনে চলবার চেষ্টা হয়ত করতেন, কিন্তু একবার ভাবাবিষ্ট হলে তাঁর পক্ষে আর কোন সাবধানতা বজায় রাখা সম্ভব হত না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে,

কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী প্রথম বৃহত্তর জনসমাজে প্রচার করেন, এবং পরবর্তী কালে যারা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্ত হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁরা অনেকেই প্রথমে কেশবের পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পড়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কোন-না-কোন সময় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যতালিকাভুক্ত ছিলেন। তাঁর গৃহী শিষ্যদের মধ্যেও মাষ্টার মহাশয় [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত], সাধু নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধরলাল সেন ও আরো অনেকে হয় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করার ফলে অথবা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে বা তাঁর পত্রিকা পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম জানতে পেরেছিলেন।[৬৫] স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, 'ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেক ঐ বিষয়ের জন্য নববিধান ও সাধারণ উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ।'[৬৬] তবে কেশবচন্দ্র সম্ভবত এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি যে, তাঁর এই প্রচারকার্যের ফলে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যে নতুন ধর্ম-আন্দোলনের সূচনা হবে তার প্রতাপে তাঁর বহু আদরের ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। এরই নাম বোধ হয় নিয়তির পরিহাস।[*]

নির্দেশিকা

১। D. K. Biswas and P. C. Ganguli (eds.) S. D. Collet's *The Life Letters of Raja Rammohun Roy* (Calcutta, 1962), pp. 73-75.

২। Ibid, Chapter IV.

৩। *The English Works of Raja Rammohun Roy* (Calcutta, 1958), p. 60.

---

* মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

৪। Ibid., Introduction to the Translation of the Moonduk Opunishud.

৫। Ibid, Part IV, pp. 95-96.

৬। *D. K. Biswas and P. C. Ganguli* (eds.), Op. Cit., p. 226.

৭। Ibid., Chapters III and VII.

৮। S. C. Chakrabarti (ed.), *The Father of Modern India*, Part II, Devendra Nath Tagore's article on "Reminiscences of Rammohun Roy", p. 177.

৯। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (বিশ্বভারতী, ১৯৬২), পৃ. ৪৩-৫৪, ১৩১-৩৬, ১৪০, ২৯৬-৩০৩।

১০। Sivanath Sastri, *History of The Brahmo Samaj*, 2nd Edition, (Calcutta, 1974), pp. 83, 87.

১১। রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', ৪র্থ সংস্করণ (কলিকাতা, ১৯৬১), পৃ. ৬৪-৬৫।

১২। Sivnath Sastri, Op. Cit., pp. 96-97, 119.

১৩। Sivnath Sastri, History of The Brahmo Samaj, (Calcutta, 1911, 1st Edn., Vol. I, p. 181.

১৪। Ibid, pp. 136-137, 143-144, 151-152.

১৫। Ibid, pp. 158-178.

১৬। Ibid, pp. 244-251.

১৭। গৌরগোবিন্দ রায়, 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' (কলিকাতা, ১৯৩৮), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪১।

১৮। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', তৃতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৩৮৮), পৃ. ১৪৪-৪৫।

১৯। স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (কলিকাতা, ১৩৮৩), প্রথম খণ্ড, সাধকভাব দ্রষ্টব্য।

২০। ঐ, পৃ. ৩৭৬।

২১। Life of Sri Ramakrishna (Mayavati, Almora, 1943), pp. 268-269, 411-419, 502-512.

২২। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'সাধকভাব', পৃ. ৪০।

২৩। ঐ, পৃ. ৪০০-৪০১, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, চতুর্থ ভাগ, পৃ. ১০৮।

২৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, (কলিকাতা, ১৩৭৫), পৃ. ৬২।

২৫। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ৮।

২৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৯।

২৭। David Kopf., *The Brahmo Samaj and The Shaping of The Modern Indian Mind* (Princeton, 1979), p. 268.

২৮। Sivanath Sastri, Op. Cit., pp. 274-293.

২৯। Live of Sri Ramakrishna, p. 272.

৩০। Ibid, p. 273.

৩১। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ১৭।

৩২। ঐ, পৃ. ২০-২১।

৩৩। Sivanath Sastri, *Men I have Seen*, (Calcutta, 1948), p. 79.

৩৪। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ১১।

৩৫। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৫৯, ৬৪-৬৫।

৩৬। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ২৪; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', প্রথম ভাগ, পৃ. ৬৬।

৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০০।

৩৮। Meredith Borthwick, Keshub Chunder Sen, *A Search For Cultural Synthesis* (Calcutta, 1977), p. 155; Sivanath Sastri, *Men I have Seen*, p. 84.

৩৯। গৌরগোবিন্দ রায়, 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০২৬।

৪০। G. C. Banerjee, *Keshab Chandra And Ramakrishna* (Calcutta, 1942), p. 7.

৪১। গৌরগোবিন্দ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৪৩।

৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬১।

৪৩। ঐ, পৃ. ৩৯।

৪৪। ঐ, পৃ. ৫।

৪৫। ঐ, পৃ. ৭।

৪৬। ঐ, পৃ. ১৯।

৪৭। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, 'সাধকভাব', পৃ. ৪০৪।

৪৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮১। 'বেদব্যাস' পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮ সংখ্যা হতে উদ্ধৃতি : "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশববাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন।"

৪৯। Meredith Borthwick, Op. Cit., pp. 157-158, 160. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেশব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ঈশ্বরের ১০৮টি নাম দিয়ে একটি সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরে এটিকে একটি সংস্কৃত স্তোত্রের রূপ দেওয়া হয়। ব্রাহ্ম সমাজের উপর পৌরাণিক উপাসনা পদ্ধতির প্রভাবের এটি একটি নির্দশন।

৫০। *The Sunday Mirror*, dated 1.8.1880, quoted in Meredith Borthwick, Op. Cit., p. 221.

৫১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৬-৭৭, ('তত্ত্বমঞ্জরী', আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ হতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

৫২। ঐ, পৃ. ১৯৯।

৫৩। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ১৮-১৯।

৫৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের পূর্বোক্ত গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' হতে উদ্ধৃতি, পৃ. ১০১।

৫৫। *Life of Sri Ramakrishna*, p. 281 ; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', তৃতীয় ভাগ, পৃ. ২৩।

৫৬। Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, pp. 64-68.

৫৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০১-১০২।

৫৮। Sivanath Sastri, Op. Cit., p. 80.

৫৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭১।

৬০। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩।

৬১। ঐ, পৃ. ৯।

৬২। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', চতুর্থ ভাগ, পৃ. ১৪২; *Life of Sri Ramakrishna*, p. 404.

৬৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬১। দুইজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনীয় উক্তির জন্য এই গ্রন্থের পৃ. ১০৩ ও ১০৬-১০৭ দ্রষ্টব্য।

৬৪। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, 'সাধকভাব', ১০-১৬ ও ২১ অধ্যায়।

৬৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' (কলিকাতা, ১৩৮৪), প্রথম ভাগ, পৃ, ১৬, ৯৫, ৯৯, ১৫০, ২৫৫, ৩০৪, ৩৪৭; দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৫, ১৬৫, ১৯৫, ২১৬, ২৩৮, ২৫৩, ২৫৭, ২৯৪, ৩৩৫, ৩৫৪।

৬৬। স্বামী সারদানন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ. ২৪।

উৎস : *উদ্বোধন*, শ্রাবণ, ১৩৮৮।

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী

চিত্রা দেব

[বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষিকা ও লেখিকা। ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—বর্তমানে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় সংশ্লিষ্টা। প্রকাশিত প্রবন্ধটি বিগত ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫ 'উদ্বোধন' কার্যালয়-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখিকা কর্তৃক পঠিত।]

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার ধারাটি খুব প্রাচীন। যতদূর মনে হয়, এদেশে জীবনী রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন সূক্তের দেবস্তবে দেখা যায়, মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে তাঁদের জন্ম থেকে কীর্তিকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে। এই দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হল জীবনী-সাহিত্য রচনার আদিরূপ। অন্যান্য দেশেও এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। এক হিসেবে *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ভাগবত*, বিভিন্ন *পুরাণ* এমনকি *বৌদ্ধ জাতক*ও জীবনী-সাহিত্য।

বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনী-সাহিত্য রচনার কোন চেষ্টা শুরু হয়নি। যদিও *রামায়ণ*, *মহাভারত* বা *ভাগবত* রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার প্রেরণারূপে এসেছিলেন দুজন অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী দেবোপম মানব। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তা ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাঙালীর চিত্তলোক যে দুটি নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হৃদয় মন্থন

করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপস মহাবীরের সঙ্গে। এঁদের আবির্ভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। তাই বাংলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই সময় তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে রাখার আগ্রহ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দেয়। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোন মহামানবের জীবনী রচনা ও তাঁর সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও শুরু হয় তখন থেকেই। বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগে আমরা যাকে জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি চৈতন্যজীবনীগুলি সে জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ হয়নি বরং এদের তুলনা করা যায় য়ুরোপীয় জিওগ্রাফী বা সন্তজীবনীগুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে সাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তব-জীবন নয়। শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তদের কাছে ছিলেন 'ভাবের মূরতি', কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও লীলামাহাত্ম্য ও আধুনিক মানুষের কাছে পরম শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। সুতরাং তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর লীলাবসানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের তাঁর জীবনলীলা প্রকাশের অন্তরেও জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর প্রকাশের ঐকান্তিক বাসনা।

চৈতন্যজীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না, কিন্তু ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী রচনার সময় এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিই বেশ পরিচিত। বিশেষ করে ব্রাহ্ম লেখকেরা দেশীয় মহাপুরুষদের জীবনী রচনায় অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করতেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় লেখকদের অনুসরণেই তাঁরা সমসাময়িক ও অনতিকাল পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলা-সাহিত্যের এই নতুন লেখাটি তাঁদের হাতেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংকলক ও জীবনী লেখকও জনৈক ব্রাহ্ম মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সংকলন করেন। পরে এই সংকলন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় সংযোজিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরে তিনিও গ্রন্থটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' নামে। স্বতন্ত্র আকারে ঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন রামচন্দ্র দত্ত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন-ভজনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের যেসব ঘটনাবলী রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ করেন।

এর কয়েক বছর পরে অক্ষয়কুমার সেন বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি অতীব সুন্দর, সুললিত ও সুখপাঠ্য। স্বামীজী তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লিখেছিলেন, 'তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন।' শুধু তাই নয়, পরবর্তী খণ্ডে লেখবার জন্যে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের পুঁথিতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা বিশেষ ছিল না। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থে মাতৃস্তব সংযোজন করেন।

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁদের গুরুদেবের জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং স্বামীজী প্রথমদিকে তাঁর গুরুভাইদের এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, 'তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না বা তা অনুমোদন করো না।' গুরুভাইদের এভাবে সাবধান করে দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী রচনার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'আমি একটা পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে।' স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা প্রথম জীবনচিত্র।

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন ম্যাক্সমূলার। তবে সংক্ষেপে *The Hindu Saint* নামে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধই 'Paramhansa Ramkrishna' নামে পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেন 'Ramkrishna : his life and sayings'। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বিদেশী জীবনীকার। স্বামীজীর নির্দেশে ম্যাক্সমূলারকে ঠাকুরের জীবনী-সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্র ও তথ্য বেলুড় মঠ থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন স্বামী সারদানন্দ। পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজস্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার কাজে লাগে।

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাণী ও উপদেশ সংকলনের কাজও শুরু হয়েছিল। ভক্ত-সাধারণের কাছে মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুরু হয়েছিল তাঁর অমৃতোপম বাণী সংকলন। এ-জাতীয় সব গ্রন্থকে না হোক শ্রীম-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীম-কে জীবনীলেখক বস্‌ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অল্‌ডাস হাক্সলি।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহাবসানের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতোই তাঁকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই সাক্ষাৎকারের যথাযথ বিবরণই 'কথামৃত' নামে বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্দ্রনাথ এই দিনলিপি প্রকাশের কথা ভাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে তিনি গ্রন্থকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে সম্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়েছিলেন।

'কথামৃতে' ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ছাড়াও আছে তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতোপম বাণী, আছে তাঁর আত্মস্বরূপের কথা। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। খণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ মানবকে উপলব্ধি করে সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না যদি তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদের জানিয়ে যেতেন। অথচ জীবনীকারকে, তিনি যাঁর জীবনচরিত রচনা করবেন, তাঁর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোন মহাত্মা বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি বিরাট বাধা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে 'কথামৃতে' তিনি স্বয়ং জীবনচরিত রচনার বহু সূত্র রেখে গিয়েছেন। সেজন্যে পরবর্তী লেখকেরা সকলেই শ্রীম-র 'কথামৃতে'র সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের জীবনী রচনা করেছেন।

মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ 'কথামৃতে'র ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনের ভার নেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামী নিখিলানন্দের সম্পাদনায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে সাল তারিখ অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা 'কথামৃতে' এই বিবরণ সাজানো নেই। পৌনঃপুনিকতা এবং প্রায় একই

ধরনের বর্ণনাও দুর্লভ নয়। পড়তে মনে হয়, 'কথামৃত' যেন সদ্য আহরিত ফুল। সাজিয়ে গুছিয়ে একটি তোড়ায় বাঁধা হয়নি। কিন্তু তাতে এখন সদ্য তোলা ফুলের সতেজ ভাব, ভোরের শিশির লেগে রয়েছে। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত বিবরণকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গ্রন্থিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

বাংলা-জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'র মূল্য অপরিসীম। স্বামী সারদানন্দ এই মহাগ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যদিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য; কেননা এতদিন ধরে এবং এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচরিত-লেখকরা সকলেই ছিলেন গৃহী ভক্ত। 'কথামৃত'ও গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে দেখা ও তাঁদের জন্যেই লেখা। এ-সময় আরও অনেকেই ঠাকুরের জীবনচরিত লেখার চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ফলে এ-আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাস বর্ম্মণের গ্রন্থের নাম স্মরণীয়। সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' ছাপা হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, গুরুদাস বর্ম্মণের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আরও কয়েকজনের কথা আগেই বলেছি। প্রথমদিকে লেখা ঠাকুরের এই সব জীবনীগ্রন্থই প্রধানতঃ শ্রুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখা হয়। সত্যচরণ লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু—ডমরু শ্রীমহিমচন্দ্র নকুলাবধূত মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া' এবং গুরুদাস বর্ম্মণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা। অবশ্য তিনি তৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থও দেখেছিলেন। অক্ষয়কুমার সেন শিহড় অঞ্চলের অনেক চাক্ষুষ বিবরণ সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছর পরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রীম-র নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনী রচনার ও অবতারত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং এরও মূল্য আছে, কিন্তু জীবনীগ্রন্থ হিসেবে এ-জাতীয় কোন গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না।

স্বামী সারদানন্দের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। তবু তিনি প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লেখার কাজে হাত দেননি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভার তাঁর হাতে ছিল এবং এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মানুষের মনে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি তাঁদের যথাযথ কর্তব্য পালন করতে পারছে না। তাঁর নিজের কথায়, 'উদ্বোধনে ছাপাবার জন্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে কেটে ছেঁটে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই এতটা ভুল প্রচারিত হবে?'

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল। সেইজন্যে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা করলেন সেটি হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'।

স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা অতি-বিস্তৃতভাবে অনুপুঙ্খ বর্ণনাসহ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'কে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এ-যুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করে। তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লীলাপার্ষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-গ্রন্থকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকে বুঝতে পারেননি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভবও হয়নি সবসময়। অনেকে মনে করতেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি—যাঁর সাম্প্রদায়িক মত বা দল সৃষ্টি করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বামী সারদানন্দ স্থির করলেন এই ভ্রান্ত ধারণাও দূর করতে হবে। 'ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে,

তারা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেবলই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই।' বলা বাহুল্য, স্বামী সারদানন্দ এ-কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে পারে, এ-গ্রন্থটি হ্যাজিওগ্রাফীর মতো শুধুই সন্তজীবনী। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা সাধকজীবনের চিত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। সকলের জীবন যেমন এক ছাঁচে গড়া নয়, তেমনি সকলের জীবনচরিত একই ধরনের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্রনাথও এই নির্দিষ্ট মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন। (যীশুখ্রীষ্ট ও রথচাইল্ড) স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। তাই তীক্ষ্ণধী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন তথ্য বা কোন সংবাদ গ্রহণ করেননি বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাপ্রসঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখিনি।' তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উক্তির মধ্যেই গ্রন্থটির প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

অবশ্য স্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই আমরা বুঝতে পারি এই মহান জীবনী গ্রন্থখানির সীমাবদ্ধতা কোথায়। এ-গ্রন্থে বিবৃত সব বিবরণই সত্য কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দূষ্য কিছুই নাই; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি এ কথা মনে না করিলেই হইল।'

'লীলাপ্রসঙ্গে'র খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা একত্রে পড়লে ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ লেখবার সময় গুরুভাব ও সাধকভাব পূর্বে লিখেছিলেন অর্থাৎ যা গৃহীভক্তদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচনা করেন। পরে তিনি ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কথা বর্ণনা করেন। এর ফলে গ্রন্থখানির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ এ-গ্রন্থে নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মতোই এ-গ্রন্থও অসম্পূর্ণ।

স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থখানি শেষ করার জন্য অন্যান্য সন্ন্যাসীরা অনুরোধ জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আর বোধ হয় হবে না। সেরূপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছা ছিল করিয়াছেন।' এখানেও নিরভিমানী সন্ন্যাসীর অরিত্রিক দার্ঢ্য ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর বরপুত্রের গ্রন্থখানি শুনতে ভালবাসতেন এবং বলতেন, 'শরতের বইয়ের সব ঠিক ঠিক লিখেছে।' তাঁর দেহাবসানের পর স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ ও আগ্রহই ছিল তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীর্বাদ তাঁর প্রেরণা।

'লীলাপ্রসঙ্গে'র ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে সাহিত্যিক আলোচনা সম্ভব আমার মনে হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে।

স্বল্প অবকাশে এখানে সে সুযোগ নেই। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর ভাষা বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও সেখানে গম্ভীর আবার ঠাকুরের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে তাঁর ভাষা সহজ সাধুগদ্য। কোথাও ভাষা অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট নয়। পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনবৃত্তান্ত ও বহু খুঁটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্রহ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। আজ পর্যন্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের কোনটি জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও চলে না। এ-ধরনের গ্রন্থ বিরল।

'লীলাপ্রসঙ্গে'র পরেও ঠাকুরের বহু জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে এখনও হচ্ছে। শুধু বাংলা গ্রন্থেরই সংখ্যা প্রায় দুশো অবশ্য সব গ্রন্থই যে জীবনী তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখার চেষ্টা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও কম নয়। এখানকার একটি গ্রন্থাগারে অসমিয়া ভাষায় তিনটি, মালয়ালম ভাষায় দশটি, তামিল ভাষায় আটটি, উর্দু ভাষায় একটি, গুজরাটী ভাষায় সাতটি, হিন্দী ভাষায় চৌদ্দটি, মারাঠী ভাষায় নটি, ওড়িয়া ভাষায় চারটি, কানাড়ী ভাষায় তেরোটি ও সংস্কৃত ভাষায় ষোলটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-সংক্রান্ত বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিদেশী বইয়ের কথা। ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরেই আমরা রোমাঁ রোলাঁর গ্রন্থখানির উল্লেখ করতে পারি। তার আগে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'Sri Ramakrishna : Face of Silence'-এর নাম করা যায়। ঠিক জীবনী না হলেও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ধনগোপাল ঠাকুরের লীলাবসানের বেশ কয়েক বছর পরে ভারতে এসে তাঁর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন। রোমাঁ রোলাঁ ধনগোপালের বই পড়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তখনও 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু দুটি খণ্ড দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে দু-হাজার বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণকে তারই মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন রোমাঁ রোলাঁ। স্বামী জগদানন্দের অনূদিত *Shri Ramakishna : the Great Master*. 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অনুবাদ। ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও শতাধিক। এ-প্রসঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউডের গ্রন্থটির উল্লেখ অবশ্যই করব। তবে লেখক নিজেই জানিয়েছেন, এ-গ্রন্থে নতুন কোন তথ্য দেবার চেষ্টা তিনি করেননি, 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত'ই তাঁর গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জাপানী ও চীনা ভাষাতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশের খবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' অবলম্বনে ঠাকুরের জীবনী রচনা করা হয়েছে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 'My Master' প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি।

বাংলাতেও পরবর্তীকালে যাঁরাই ঠাকুরের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই উক্ত গ্রন্থদুটিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলের পক্ষে ঐ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই এ-গ্রন্থ লেখা হয়। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটি অবলম্বনে রচিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও সজনীকান্ত দাস সংকলিত ও সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী না হলেও জীবনচরিতের বহু উপাদান সম্বলিত একখানি গ্রন্থ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চমকপ্রদ ও নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। তবে এ-গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। আকর্ষণীয় করবার জন্যেই নীরেন্দ্র গুপ্ত 'কথামৃত' থেকে সংকলন করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত'।

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ-ব্যাপারে লেখক ও পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল যদিও এখন ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থগুলি দূর থেকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। সংসারীদের ঝোঁক অলৌকিকত্বের প্রতি, সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের প্রতি, তবু তাই নয়, তাঁরা ঠাকুরকে দেখেওছেন দু-ভাবে—সন্ন্যাসীভক্তরা অন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা বহিরঙ্গরূপে। উভয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পড়ার পর। তবে একটি ক্ষেত্রে উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই ঠাকুর অহৈতুকী করুণার আধার, কৃপাসিন্ধু। ভক্তির আলোয় 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' সমান উজ্জ্বল।

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তাঁর জীবনী রচনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় পরবর্তীকালে আমরা আরও অন্যান্য বহু সাধকের জীবনের কথা জানতে পেরেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরা বাংলা-সাহিত্যের একটি দুর্বল শাখাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেশি। ধর্মগ্রন্থ বলে এ-সব জীবনীগ্রন্থকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ত্যাগপূত জীবন, নিষ্কামকর্ম, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিবেশন করা যায়।

উৎস : *উদ্বোধন*, আশ্বিন, ১৩৯২।

সংযোজন-১, ১ক

পরমহংস রামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষে সভাপতির অভিভাষণ

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

প্রিয় সুহৃদবৃন্দ,

সন্ত পরমহংস রামকৃষ্ণে জন্মশতবর্ষ, কিংবা বলা যায় এই পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের জন্য আমরা মিলিত হয়েছি, আর আমরা অবশ্যই শান্ত ভাবাবেগহীন চিত্তে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হব।

পঁচিশ বছরেরও আগে, ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে আমি 'স্বামী বিবেকানন্দের মানসিক বিকাশের প্রাথমিক স্তর' নামে একটা সন্দর্ভ লিখেছিলাম। সেই লেখার সমাপ্তি পর্বে উল্লেখ করেছিলাম এক বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের গুরুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের। সেই সাক্ষাৎলাভ আমার মনে যে ঝড় তুলেছিল, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল সেই সন্ধ্যার আবহাওয়া। আর এখন অগ্রসরমান মৃত্যুর শান্তি আর ভাবাবেগহীনতায় এমন একজনের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনে অংশলাভকে আমি, একটা বিশেষ সুবিধে বলে মনে করি—যিনি এই পৃথিবীর প্রবাসে ছিলেন স্থান ও কালের উর্ধ্বে।

রামকৃষ্ণের ক্রমান্বয়ী ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসমূহ : তাঁর ধর্মীয় জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশ

রামকৃষ্ণের ধর্মীয় জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশের আনুপূর্বিক পর্যায়গুলো সুপরিচিত আর এভাবেই সারসংক্ষেপ করা হয়েছে :

১। তাঁর ছেলেবেলার শুরুতে তিনি জনপ্রিয় কৃষ্ণলীলা এবং গাজনের গানে অংশ নিতেন। এইসব জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে তিনি কৃষ্ণ কিংবা শিবের ভূমিকায় নামতেন।

২। তাঁর দাদার মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পুরুত হলেন। তিনি মা কালীর সাক্ষাৎ পেতে চাইলেন এবং মা কালী যদি দেখা না দেন তবে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যার হুমকি দিলেন। অর্ধোন্মাদ হয়ে অবশেষে তিনি মনে করলেন তাঁর কালীদর্শন হয়েছে।

৩। তিনি এখন কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন কাঞ্চন-কামিনী ত্যাগের। এক হাতে সোনা আরেক হাতে মাটি নিয়ে তিনি অস্ফুট স্বরে বলতেন, 'সোনা মাটি, মাটি সোনা।' একইরকম ভাবে তিনি রক্ত-মাংসের সব বাসনা জয় করলেন এবং অবশেষে সব নারীকেই মাতৃরূপে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন।

৪। এই সময় তাঁর কাছে এলেন এক যৌবনবতী সুন্দরী নারী যিনি তাঁকে দীক্ষা দিলেন তন্ত্রসাধনার। সেই নারীর কোলে শুয়ে তিনি ধ্যান করলেন কালীর। এই নারী পূজাচারে মদ মাংস ব্যবহারকারিণী বামাচারিণী। নিরাবরণা দেবী রূপে রামকৃষ্ণ তাঁকে পূজা করলেন আর এইভাবে তাঁর ভিতর সমস্ত যৌনবাসনা দগ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হল।

তাঁর সাধনা এবং ধর্মীয় কৃত্যাবলি

তাঁর সাধনায় এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলায় তিনি প্রতিটি ধর্মের সার্বিক অভিজ্ঞতা গ্রহণে তৎপর হলেন। যথোপযুক্ত পোশাকে, মনোভাবে এবং আচারানুষ্ঠানে কখনও তিনি মুসলিম ফকির, কখনও মোক্ষলাভে ব্যাকুল পাপবোধ জর্জরিত ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান নবিশ। এসব কিছুতেই কোনো ভান বা কাল্পনিকতা ছিল না। এখানে দেখি এক ব্যক্তিসত্তা যিনি ধর্মীয় জীবনে এবং ইতিহাসে সমস্ত মানবিক অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করছেন। এভাবেই তাঁর হিন্দু ঐতিহ্যে যুক্ত হল মহার্ঘ্য উপাদানগুলি—মুসলিম বিশ্বাসের মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্য, খ্রিস্টানের পাপমুক্তির প্রয়োজনীয়তা। একইরকম ভাবে তাঁর ধর্মীয় অনুশীলন সমূহে যুক্ত হয়েছিল বৈষ্ণব সংকীর্তন এবং সংগীত। এইগুলি পরিণত হল তাঁর সাধনার অঙ্গে।

রামকৃষ্ণের উপর প্রাথমিক ব্যক্তিপ্রভাবসমূহ

১। গোড়ার দিকের যাঁরা রামকৃষ্ণকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের একজন সন্ত দয়ানন্দ সরস্বতী যিনি বেদনির্ভর একটিমাত্র সার্বজনিক ধর্মীয় মতের প্রবক্তা এবং সমস্ত রকম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আগ্রাসী। কিন্তু তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর হতে পারেনি। রামকৃষ্ণের শুদ্ধতা তাঁকে সমস্ত হিন্দু আচার-বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তিনি জাতপাত অস্বীকারই করলেন না, সেবা করলেন মেথরদের—যা গোঁড়া বৈদিক ভ্রাতৃমণ্ডলীর কাছে খুব সুখকর হল না। তিনি তোতাপুরী এবং অন্যান্য ভারতীয় সন্তদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন আর তাঁর অভিজ্ঞতাগুলি তাঁকে তাঁর জীবনব্রতর জন্য তৈরি করতে শুরু করে। এই তোতাপুরীই তাঁকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাদান করেন।

২। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবাধীনে আসেন। যে কালীর আরাধনা তাঁর অন্তরে স্বর্গীয় মাতৃত্ববোধ জাগিয়েছিল, সম্ভবত এই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সেই বোধকে গভীরতা দান করে। যে সমস্ত সামাজিক কুরীতি ও অনৈতিকতা পরবর্তী হিন্দু ধর্মীয় আচরণকে কলুষিত করেছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচারিত নববিধান তাঁকে সেসব সম্পর্কে সচেতন করে তুলে তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে।

ধর্মীয় জীবন ও আদর্শে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মৌলিক অবদান : তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ

১। স্বয়ং রামমোহনের মতো রামকৃষ্ণের ছিল এক বিমিশ্র সত্তা। পরমত্বের দৃষ্টিকোণ (*নিরুপাধি*) থেকে তিনি সত্য মননে সমস্ত শর্ত এবং রীতিপদ্ধতিকে (*উপাধি*) অস্বীকার করেন। কিন্তু আপেক্ষিক ও শর্তাধীন দৃষ্টিভঙ্গি (*সোপাধি*) থেকে মা কালী এবং অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। তিনি সমস্তর মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে সমস্তকে আরাধনা করেন এবং এর মধ্যে তিনি তো কোনো দ্বন্দ্ব দেখেনই না, বরং পূর্ণতর সত্য প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি মেলবন্ধন ঘটান সাকার ও নিরাকার উপাসনার। তাঁর কাছে দেবমূর্তিতে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। বস্তু এবং ভাবের বৈরিতা তাঁর কাছে আর থাকে না।

২। যে বিষয়টায় তিনি নিজেকে প্রতারণা করতে গররাজি তা হল তিনি রক্ত-মাংসের সমস্ত শর্ত এবং দুর্বলতার উর্ধ্বে। কিন্তু তিনি তাঁর ভাবসমাধিতে শুদ্ধতম রূপে তাঁর মহোল্লাসের বিকাশ ঘটান, যে অভিব্যক্তি একহার্ট এবং টওলারের কাল থেকে পাশ্চাত্যের ধর্মভুবন প্রায় প্রত্যক্ষই করেনি।

৩। অধিকাংশ হিন্দু সন্তের মতো তাঁর ছিল ঘরোয়া প্রবাদ, প্রবচন, উপমা, রূপক এবং নীতিগল্পের অনিঃশেষ সম্ভার যা আধ্যাত্মিক সত্যকে সামান্যতম বোধবুদ্ধি, এমনকী শিশুর কাছেও প্রাঞ্জল করে তোলে।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ

আধুনিক ভারতের অগ্রদূত এবং প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভারতের জনক রামমোহন রায় খুঁজেছিলেন সার্বজনিক ধর্ম—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য বিশ্বাসের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কিছু ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমস্ত জাতীয় ধর্মই এই সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে।

গোড়ার কথা হল তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তায় তিনি দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছিলেন :

১। সার্বজনিকতাবাদী হয়ে সদর্থক ও গঠনমূলক পথে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের নবপ্রেম ভাবনার নব্য ঐশ্বরিক মানবহিতৈষণা ('নিও-থিও-ফিলানথ্রপি') নামে ধর্মমত উদ্ভাবন করেন। এই ভিত্তিতে তিনি *গায়ত্রীর* ব্যাখ্যা করেন। বিস্ময়করভাবে এই হিন্দুই 'ইউনিটারিয়ান' ধর্মমত এবং উপাসনার পাশ্চাত্যের চারজন উদ্ভাবকদের একজন; বাকি তিনজন প্রাইস, প্রিস্টলি এবং চ্যানিং।

২। জাতীয়তাবাদী সংস্কারক রূপে রামমোহনের ছিল ত্রিবিধ অভীষ্ট :

ক। হিন্দু সংস্কারক রূপে তিনি *বেদান্ত* এবং *মহানির্বাণতন্ত্র* থেকে হিন্দু শাস্ত্রের ইউনিটারীয় পুনর্নির্মাণ করেন।

খ। মুসলিম বিশ্বাসের সমর্থকরূপে তিনি লিখলেন *তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদিন* এবং *মনাজারাতুল্ আদিয়ান*। এই দুটো ধর্মীয় বাদানুবাদিক গ্রন্থ।

গ। খ্রিস্টান হিসেবে খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিতর্কে তিনি ইউনিটারীয় ভাবধারায় নতুন পুরনো সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন।

এইভাবে দেখা যায় রামমোহন সার্বজনিকতাবাদী হয়ে নিজে একের মধ্যে হয়ে ওঠেন জাতীয়তাবাদীত্রয়।

হিন্দু ঔপনিষদিকে ভিত্তির উপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত, আচার-অনুষ্ঠানাদি সংগঠিত করেন।

হিন্দু কিংবা খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বমুক্ত সার্বজনিক ধর্ম গড়ে তোলার কাজ এসে পড়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপর। তিনি সারগ্রাহী প্রক্রিয়ায় এই প্রচেষ্টা চালান আর এই প্রক্রিয়াতেই তিনি আচারানুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি রীতিবদ্ধ করেন। শুরুতে কেশব খ্রিস্টধর্মকে তাঁর কেন্দ্রীয় ধর্ম করেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে আবেগাপ্লুত ধর্মীয় জীবনের জন্য উত্তরোত্তর বৈষ্ণবপথে আকৃষ্ট হন। অভূতপূর্বভাবে তিনি ধর্ম, ধর্মীয় অভিজ্ঞতাসমূহ, আচারানুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতিকে বহুমুখী এবং সুসম্পূর্ণ করে তোলেন। কেশবের নববিধানে অবদান রাখে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, বৈষ্ণব এবং আরও অন্যান্য ধর্মের সারবান নির্যাস, যা নতুন তা হল সারগ্রাহী রীতিপদ্ধতি এবং সংস্কৃতি।

পরবর্তী পদক্ষেপ (বাস্তবিকপক্ষে মৌলিক উদ্ভাবন) রামকৃষ্ণ পরমহংসের। রামকৃষ্ণ নিজেকে অভিজ্ঞ করে তোলেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রীতিপদ্ধতি এবং ধর্মকে তার সামগ্রিকতায় সামষ্টিক একক অভিজ্ঞতারূপে।

কীভাবে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র

কেশবচন্দ্র গুরুত্ব দিয়েছেন প্রত্যেক ধর্মের কেন্দ্রীয় মর্মার্থের উপর এবং স্বীকার করেছেন তার সত্যকে। এই অর্থে কেশবচন্দ্রে কথা হল, "সব ধর্মেই সত্য আছে না বলে বলতে হয় সব ধর্মই সত্য।" কিন্তু যেহেতু ধর্ম বিভিন্ন তারা সত্যের নানা দিক উদ্‌ঘাটন করে।

তারা জীবনের অংশ নয়, সম্পূর্ণ জীবনকেই ব্যাখ্যা করে, কিন্তু প্রত্যেকেই একটা মৌলিক অবস্থান থেকে।

কিন্তু ধর্মমতগুলি একে অপরের সঙ্গে বিরোধিতা করে। প্রত্যেকেই নিজের সত্যতা এবং অন্যের ভ্রান্তি দাবি করে। কিন্তু কেশব ভিন্ন হলেন। তিনি এইসব বিভিন্ন অবস্থান থেকে জীবনকে দেখলেন প্রত্যেক মতের

সারগ্রাহিতায়। প্রত্যেক ধর্মের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সারমর্মকে তিনি সংকলন করলেন। ব্রাহ্ম ভাবধারায়, বিশেষত নববিধান মতবাদে তিনি এইসব আংশিক দিকগুলিকে তুলনামূলকভাবে একত্রিত করে সূত্রায়িত করলেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, কেশবের দৃষ্টিকোণে প্রত্যেক ধর্মই তার কেন্দ্রীয় সারবত্তায় সত্য। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্যকে ধারণ করে না, সে সত্যকে পাওয়া যাবে কেবলমাত্র সারগ্রাহী পথে। নববিধান প্রত্যেক ধর্মের কেন্দ্রীয় সারসত্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংকলন করে।

কিন্তু কেশবচন্দ্রকে অবশ্যই ভুল বোঝা উচিত হবে না। রামমোহনের সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন সব ধর্মের ঐক্যে, কিন্তু তিনি, তাঁর কথা অনুযায়ী, সব সত্যের সংগ্রহ না বুঝিয়ে একটি আদর্শের মধ্যে সব সত্যের ঐক্যবদ্ধতা বোঝাতে চেয়েছিলেন। সুতরাং ঐক্য এবং সার্বজনিকতা হবে সারগ্রাহিতার গুণ এবং ধর্মের আন্তর্জাতিক প্রকাশের প্রতিভূ। আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি ছিল রামমোহনের বিশ্ববাদ।

নববিধান ধর্মমতের পরবর্তী বিকাশ ঘটেছিল এবং তা সর্বশেষ পর্বে পৌঁছেছিল সাংশ্লেষিক বিশ্বাস এবং মতসমূহের সুন্দর সংশ্লেষের ভিতরে সব ধর্মের সংহতিবোধে। এই সংশ্লেষ অবশ্যই সংস্কৃতিসমূহের সংশ্লেষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

অবশেষে, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সাধারণবাদীদের পৃথক হয়ে যাওয়ার পর নববিধানের প্রতিষ্ঠা হল ১৮৭৯-১৮৮২ সালে এবং নীতির অনুক্রমিক সম্প্রসারণ পরিস্ফুট হল : (১) প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রাচ্যায়ন ('ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট'), এবং (২) গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নববিধানের বেদ-বেদান্ত-পৌরাণিক ব্যাখ্যানে। নববিধানের বর্তমান অবস্থান এই তিনটি ধারারই একত্রীকরণ।

এইসব বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে কেশবের মত ছিল সারগ্রাহী। আর এইখানেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের পার্থক্য। বাস্তবিক পক্ষে দুটো মূলগত বিষয়ে তিনি পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্নগামী :

১। তিনি মনে করতেন তাত্ত্বিক সূত্রাবলি বা ধর্মমতের চাইতে প্রত্যেক ধর্মের আচার অনুষ্ঠান এবং রীতি শৃঙ্খলার অনুশীলন তার সারসত্তাকে

দিতে পারে অনেক প্রাণবন্তভাবে ও প্রত্যক্ষতায়।

২। কোনো ধর্মের নির্বাচননির্ভর সারগ্রাহিতায় নয়, পূর্ণপ্রাণে গ্রহণ এবং বিভিন্ন মতের ঐক্যসাধনেই তার পূর্ণ মূল্য সহ গুরুত্বের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতালাভ হয়।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন যে সংকলিত নির্যাস প্রত্যেক ধর্মেরই প্রাণসংহারক। প্রত্যেকটি ধর্মের সামগ্রিক সত্য এবং ফলপ্রসূতার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দু হতেন, মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান, খ্রিস্টানদের সঙ্গে খ্রিস্টান। কিন্তু একই সময়ে বিভিন্ন ধর্মের রীতিশৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন ধর্মমত অনুশীলন করেননি। প্রত্যেক ধর্মের কৃত্যাবলি এবং আচার-অনুষ্ঠান সেই ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ধর্মীয় সাধকতা এবং সত্যের অভিজ্ঞতালাভের জন্য তিনি মুসলিম অথবা খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের সম্পূর্ণ ধর্মমত এবং রীতিনীতি পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইসব কিছুর মধ্যে হয়তো থাকতে পারে প্রলোভন এবং পতন সম্ভাবনা। কিন্তু সরল অনাবিল শিশুর মতো আগুনের ভিতর দিয়ে চলে যেতে হবে অক্লেশে। এইভাবেই পরমহংস পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টান এবং মুসলিম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর ঐক্যসাধনরীতি এইরকম।

যোগসাধনা ও কৌমার্যের প্রশ্ন

ধর্মপ্রতিষ্ঠার মহাপুরুষেরা ছিলেন যোগী অথবা সন্ন্যাসী। যেমন বুদ্ধ এবং খৃষ্ট! তেমনি ছিলেন সেইন্ট ফ্রান্সিস, চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ। মানবমুক্তির জন্য তাঁদের অধিকাংশই ত্যাগ করেছিলেন মা কিংবা স্ত্রীকে। মানবজাতির মোক্ষদাতাদের মা ও স্ত্রীরা এইভাবে পরার্থে কষ্টভোগ করেছেন। এইসব ধর্মগুরুদের আদর্শ ছিল কৌমার্য।

অন্যান্য আদর্শ

মানবজাতির চৈনিক এবং গ্রিক শিক্ষকেরা এবং প্রাচীনকালের ভারতীয় ঋষিরাও পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করেননি। গান্ধীর ক্ষেত্রেও তাই। আধুনিক আদর্শও এটাই।

ধর্মে আধুনিকতা

রামকৃষ্ণ একজন অকিঞ্চিৎকর জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, ধর্মে তিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতাবাদী। তিনি যে প্রেরণা ও উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, আমাদের যুগে তাকে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করতে হবে।

খ্রিস্টান ধর্মমত থেকে আহূত আমাদের কালের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল ক্লিষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস, লক্ষ লক্ষ অধিকারচ্যুত এবং মানবসমাজের ব্রাত্যজনের বিশ্বাস। সাধারণভাবে ধর্ম যেভাবে বোঝা হয়, কেবলমাত্র সেই ধর্মে বিশ্বাস নয়। মানবতাবাদের এখন বিভিন্ন নতুন পর্যায় এবং সম্প্রসারণ ঘটছে। পরম সত্তার (Grand Etre) উপাসক কঁৎ (Comte)-এর দৃষ্টবাদী মানবতাবাদ, Babism এবং তার শাখা Bahaism—মানবভ্রাতৃত্ব বোধের এইসব ধর্মকে ছাড়িয়ে আমরা পরবর্তীকালীন ঈশ্বরবিহীন ধর্মমতের (যেমন জুলিয়াস হাক্সলি এবং একালের আরও অনেকের) পর্যায় দেখে নিতে পারি। এই-ই সব নয়। ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণার বদলে মাঝে মাঝে এসেছে সত্য, সুন্দর, শুদ্ধতার বিমূর্ত ধারণার আদর্শ। কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিই আজকের দিনে তার নিজস্ব খোরাক দাবি করে না। বিজ্ঞানের জন্য আবেগ, দর্শনের জন্য বরং বৈজ্ঞানিক দর্শনের জন্য আবেগ, শিল্প অথবা নান্দনিক অনুভূতির জন্য আবেগ সাধারণভাবে আজ আমাদের সংস্কৃতিতে আধুনিকতার চিহ্ন এবং তা প্রাচীন ধর্মীয় অনুভূতিকে সরিয়ে দিতে চায়। হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞাবাদ, ডারউইনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবেগহীনতা যা অতীতের বেকনীয় স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ধারণা বই কিছু নয় এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের আস্তিক্য যা অজ্ঞাবাদ এবং জরথুস্ট্রীয় দ্বৈতবাদের সাময়িক বৈচিত্র্যসহ সংরক্ষণ করে ধর্মীয় বিশ্বাসহীন ধর্মের গুরুত্ব—এই সবকিছুই ঈশ্বর অন্বেষী এ-কালের মানুষের দৃষ্টান্তমাত্র।

ধর্ম মহাসভা

আমাদের বর্তমান খোঁজ ধর্ম মহাসভা, যে অন্বেষণ আজকের এই সম্মেলনে আমরা ব্যক্ত করতে চাই। কিন্তু এটা মনুষ্যজাতির মহাসভা অথবা বিশ্ব সংস্কৃতির ঐক্য সাধনের দিকে একটি সোপান মাত্র।

বিশ্বাস, ধর্মমত এবং স্থাণু মতবাদ মানুষে মানুষে বিভেদ আনে। কিন্তু আমরা ধর্মে খুঁজি মানবতার মিলনক্ষেত্র। আমরা যা চাই তা শুধু নির্যাসিত সার্বজনিক ধর্ম নয়, যা প্রথম দিকে রামমোহন খুঁজেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক পৃথক পৃথক সারসত্তার যোগে সারগ্রাহী ধর্ম নয়, কেশবচন্দ্র যেমন খুঁজেছিলেন—কিন্তু একটা সামগ্রিক অভিজ্ঞতা যা নিজেকে মানবেতিহাস উন্মোচিত করেছে, রামকৃষ্ণের শিক্ষায় হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু হয়ে, মুসলমানের সঙ্গে মুসলমান হয়ে, খ্রিস্টানের সঙ্গে খ্রিস্টান হয়ে এবং সার্বজনিকতাবাদীর সঙ্গে সার্বজনিকতাবাদী হয়ে ধর্মের মিলনাত্মক অনুশীলনে। আর এই সবই ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছনোর সিঁড়ি।

আমি এ পর্যন্ত ধর্মকে স্থূলার্থে গ্রহণ করে ধর্ম মহাসভার কথা বলেছি; কিন্তু এখন ধর্মকে এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে নেব জীবন এবং ইতিহাস রচনার শক্তিরূপে।

বিস্তৃততর অর্থে ধর্ম, যা স্থূলার্থ থেকে পৃথক, জীবন এবং জীবনের কার্যাবলিকে পরিচালিত করার একটা শক্তি। বস্তুত এই পর্যায়ে সমস্ত কৃষ্টি এবং সমস্ত ধারণা ধর্মীয় ভাবনার দ্বারা মুখ্যত প্রভাবিত। খাদ্য, যৌন-সম্পর্ক, পরিবার, জনজাতির জীবন এবং যুদ্ধ সবই নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় আদর্শে। কোনো জাতি বা জনসমষ্টির ধর্মের কেন্দ্রীয় ভাবনার চারিদিকে সংঘবদ্ধ হয় প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও জনজীবন। প্রগতির পথে উচ্চতর ধর্ম বিবর্তিত হয়, এই ধর্মীয় বিবর্তনের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার শিখর ধর্ম মহাসভা।

কিন্তু ধর্মীয় প্রকাশ কেবলমাত্র চূড়ান্ত ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ নয়। আমাদের বিজ্ঞানও আছে, দর্শন কিংবা (আরও ভালো) বৈজ্ঞানিক দর্শন, শিল্প অথবা নান্দনিক অনুভূতি, রস (সেন্টিমেন্ট) অথবা রসানুভূতি অথবা আরও আছে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা—এই সবই মানবতাবাদের পর্যায়সমূহ এবং পরিপূর্ণতা দেখা যাবে বিশ্ব-মানবতাবাদে যা বিশ্বে মানুষকে এবং মানুষের মধ্যে বিশ্বকে দেখে মানবতাবাদকে তার দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে। আমরা অবশ্যই মুক্তি সন্ধান করব এ অবস্থা সে অবস্থা থেকে নয়, সৌরজগৎ থেকে, নক্ষত্রমণ্ডল থেকে এবং তা পেরিয়ে, এক কথায়, বিশ্ব থেকে।

ধর্ম মহাসভা অগ্রদূত ছাড়া কিছু নয়, আবাহন করে এক নতুন বিন্যাসের সূচনার। যে ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিকাশের কেন্দ্রে তাকে অবশ্যই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে আরও অনেক মানুষের জন্য—যেমন জনসমষ্টি, সম্প্রদায় এবং যুগ আর এইসব কিছু অবশ্যই সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে মানবতাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে—

ক। মানবিকতার আগামী ব্যবস্থায় গণসচেতনতা এবং সমষ্টির মন হবে নিয়ন্ত্রক ধারণা।

খ। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী হিসেবে গোষ্ঠীজীবন তার পরিতৃপ্তি খুঁজবে।

গ। এই বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায় হবে যুগ এবং যুগ সচেতনতার নিয়ন্ত্রক ধারণা।

ঘ। আমাদের বিকাশমান জীবনের প্রধান কারক হিসেবে জাতি (অথবা সামগ্রিকভাবে মানবিকতা) সচেতনতা দ্বারা এইটি সুসম্পন্ন হবে।

আমাদের আজকের আশু উদ্দিষ্ট ধর্ম মহাসভা। কিন্তু আমার মতে এটা বৃহত্তর মহাসভার—বিশ্ব সংস্কৃতি সংঘের উচ্চারক মানবজাতির মহাসভার উপক্রণিকা মাত্র। আমি যেমনটি বলেছি, এই সভার লক্ষ্য হবে মানবিকতার প্রগতিশীল বিকাশ রূপে অনড় নয়—গতিশীল ধারণাজাত জীবনের সাংশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা।

(ভাষান্তর : মহেশ্বর ভট্টাচার্য)

উৎস : *Religions of the World*, Part-I, 1938

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষে : উদ্বোধন-ভাষণ

সরোজিনী নাইডু

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

এই মুহূর্তে আমি কোনো বক্তৃতা দিতে চাইছি না। আপনারা নিশ্চয়ই বক্তৃতায় বক্তৃতায় ক্লান্ত হবেন; কিন্তু সভার শেষে আমার হয়তো দু'-একটা কথা বলবার থাকবে। আমি শুধু আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই আর আমাকে একটা গোটা অধিবেশনের কার্যধারা পরিচালনার যোগ্য ভাবার জন্য আপনাদেরকে এবং সংগঠকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি অন্যদিনেও বলেছি আমি ধর্মযাজকও নই, দার্শনিকও নই, পণ্ডিতও নই—আমি শুধু একজন সামান্য ভ্রাম্যমাণ কবি, যদি সেটাই যোগসূত্র তৈরি করে এমন কারও সঙ্গে—যিনি ক্ষমতাবানদের উচ্চাসনে বসেন, যাঁরা বিদ্বান এবং তত্ত্ব, মতবাদ এবং দর্শনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পারদর্শী—তাহলে সেই ক্ষমতাশালী জায়গায় থাকতে পেরে আমি গভীরভাবে সম্মানিত। মুদ্রিত কর্মসূচি পালন করতে আমি এখন তাঁদেরকে ডাকব যাঁরা প্রকৃতই মুদ্রিত কর্মসূচিতে রয়েছেন, আমার মতো অনুভাবনার নন। সবার আগে অধ্যাপক সরকার একটা ঘোষণা করতে আসছেন আর তারপর থাকবে বার্তা, বক্তৃতা এবং লিখিত প্রবন্ধাবলি।

সমাপ্তি কথা

আমি এক মিনিটের জন্য বলতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। আপনারা অনেক ধর্মমত এবং তাদের সংশোধনীর উপর অনেক বক্তৃতা শুনেছেন, মূল ধর্মসমূহ এবং ধর্মীয় প্রতিপক্ষের প্রতিবাদও শুনেছেন। এসবই হল তাঁদের কাজ যাঁরা তাঁদের বিশ্বাস বিশ্লেষণে কিংবা তাঁদের ধর্মবিশ্বাস এবং

মতবাদ সংশ্লেষে পারঙ্গম। আমার মতো একজন মানুষ যাঁর কোনো ধর্মমত নেই, যিনি কোনো উপদেশাবলি অনুসরণ করেন না, সমস্ত মানবজাতির পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে এগিয়ে যেতে সাহস পান না, তাঁর এমন কিছু বলার থাকে না যা ইতোমধ্যেই বলা হয়ে যায়নি। শেষ বক্তা যিনি আমার মতনই নিজেকে বম্বের নাগরিক বলে দাবি করেন, তিনি সবশেষে সবচেয়ে চমৎকারভাবে শেষ কথা বলেছেন। এই ধর্ম মহাসভা সমবেত হয়েছে বিশ্বাসে বিশ্বাসে পার্থক্য খুঁজে বার করতে নয়, জড়ো হয়েছে সংযোগকারী গভীর ঐক্য অনুসন্ধান করতে। উৎস থেকে, মূল থেকে, মাটির গভীর থেকে জল উৎসারিত হয়—কিন্তু তা চলে যায় বিভিন্ন খাতে, অনেক নদীতে, অনেক উপনদীতে। ভূগর্ভ থেকে যে বীজকে আরও বীজের জন্ম দিতে হবে সে চারাগাছ তৈরি করে, গাছ বড় হয়—শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে, কিছু নীচের দিকে ঝুঁকে যায়, কেউ যায় আকাশমুখী, কেউ হয় আঁকাবাঁকা, কেউ সোজা। যে ডালপালা নীচের দিকে বেড়ে ওঠে এবং ক্লান্তকে ছায়া দেয় আর যে ডালপালা ঊর্ধ্বে উঠে যায়—তারা সকলেই পুষ্টি পায় একই শিকড় থেকে, যে জেগে ওঠে মাটির বুক থেকে। কোনো শাখা কি বলবে, ‘আমি আলাদা?’ ফুল তো একই এবং প্রাণরসও একই। ‘দেখ, আমার সৌন্দর্য তোমাকে দেওয়া হল, অন্যান্য ডালকে নয়’—ঋজু ডালকে এই কথা বলে বসন্তকাল তো কোনো পক্ষপাত ঘটায় না। আর তাই আমরা বলি সব বিশ্বাস, সব মত বেরিয়ে আসে একই উৎস থেকে আর সেই উৎস হল মানবতার প্রয়োজন। আমি একথা বলি না যে এটা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, আমি বলি এটা আসে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থেকে। আমি বলি না যে ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আমি বলি মানুষ তার জরুরি এবং আবশ্যিক প্রয়োজনে ঈশ্বরকে সৃষ্টি এবং পুনর্নির্মাণ করে প্রতিদিন। যাই বলা হোক না কেন, আমাদের নিজেদের উৎকৃষ্টতমের ব্যক্তিগত সচেতনতা ছাড়া ঈশ্বর আর কি?

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাগানে পাথরে তৈরি একটা শূন্য মন্দির আছে। একদিন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতামালা দিচ্ছিলাম, সেটা ছিল শেষ দিন, বাগানে তাঁর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি আমাকে বললেন,

'আজকের ভাষণের বিষয় আপনি খুঁজে পেয়েছেন?' আমি বললুম, 'না।' তিনি তখন বললেন, 'আজকের বিষয় আপনি এখানে পাবেন।' তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তাকাচ্ছিলাম পাখিদের দিকে, গাছেদের দিকে, মূর্তিগুলোর দিকে আর সবশেষে এসে দাঁড়িয়েছিলাম সেই শূন্য মন্দিরের সামনে যখন তিনি বললেন, 'কবি, পেলেন কি আপনার সমাচার?' আমি বলেছিলুম, 'পেয়েছি।' এখানে এক শূন্য মন্দির যার মধ্যে কোনো বিগ্রহ নেই, কারণ প্রত্যেক উপাসক এই শূন্য মন্দিরে এই জ্ঞান খুঁজে পাবেন যে তিনি তাঁর অন্তরের আদলে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে পৃথিবীর সমস্ত মহান সন্ত আর ধর্মগুরুদের বার্তা এটাই আর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাচারও এই-ই। তাঁর কাছে মন্দির ছিল সবসময় শূন্য কারণ তা ছিল সবসময় প্রস্তুত। তাঁর দেবতা বসানোর জন্য মন্দির তাঁর কাছে সবসময় প্রস্তুত, কিছুই যায় আসে না—ক্ষণেকের জন্য তিনি নিজেকে অভিক্ষেপ করবেন মুসলমানের অন্তরে নাকি খ্রিস্টানের, কনফুসিয়াসের কিংবা জরথুস্ট্রীয়ের কিংবা শিখ অথবা অন্য কোনো বিশ্বাসে। তিনি বলতেন, 'এখানে এক মানবতার মন্দির আছে আর মানবতার অবশ্যই প্রয়োজন একজন দেবতার! আমি তাঁকে কোথায় পাব? আমি কি তাঁকে তৈরি করব আমার সীমিত ব্যক্তিগত চেতনায়? নয়তো ঈশ্বর এত অসীম এবং এত বিচিত্র যে আমি তাঁকে খুঁজব অসীমের মূর্তিতে যেমন তিনি তাঁর সন্তানদের কাছে হাজির হন আরবের মরুভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায়, নানান দেশের অরণ্যে।' শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিখিয়েছেন যে মন্দির শূন্য থাকে, কারণ কেবলমাত্র প্রেমই সৃষ্টি করতে পারে ভগবানের প্রতিমা আর সেই সপ্রেম তুমি সীমিত নও, তুমি বিশাল মানবজাতির অংশ হয়ে যাও, যে মানবজাতি নানান নামে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তুমি আল্লা-হো-আকবরই বল আর জরথুস্ট্রীয়দের অগ্নি মন্দিরের সামনে অবনত মস্তক হও কিংবা খ্রিস্টানদের ক্রুশের সামনে নতজানু হও, অথবা গুরুদোয়ারার গ্রন্থসাহেবের কাছে যাও, তুমি বুঝতে পারবে তাদের সকলের সঙ্গে একত্ব আর তুমি বুঝবে তোমার সহানুভূতি, বোধ গ্রহণ করবার প্রস্তুতির সীমাবদ্ধতা ছাড়া কেউ তোমার মানবতাকে সীমায়িত করতে পারে না। এটাই একমাত্র বার্তা যা আমি আপনাদেরকে

দিতে পারি। কারণ এটাই একমাত্র সমাচার যা আমার বাবা আমাকে ধর্ম বলে শিখিয়েছিলেন। এটাই একমাত্র ধর্ম যা আমি আমার জন্য খুঁজে পেয়েছি আমার শৈশবের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যের কথা ভাবতে ভাবতে মুসলিম নগর হায়দরাবাদে একদিন আমি আমার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার বাড়ির পেছন থেকে প্রার্থনায় আহ্বানের কণ্ঠস্বর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধারে-কাছে কোথাও বেজে উঠল হিন্দু-মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি আর আমার থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এক উপাসনালয় ছিল জরথুস্টের যেখানে আগুন জ্বলে অনন্তকাল ধরে—যেদিন থেকে জরথুস্টীয়রা জাহাজে করে জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল আর অগ্নিমন্দিরগুলিতে স্থাপন করেছিল আগুন—সেইদিন থেকে এই আগুন এক মুহূর্তের জন্যও নেভেনি, নিভতে দেওয়া হয়নি—আর হঠাৎই আমার মনে হল কী চমৎকার সুযোগ আমি পেয়েছি এমন এক নগরে বাস করার যেখানে মন্দির, মসজিদ, অগ্নি-দেউল সব একসঙ্গে, এত কাছাকাছি, আর পূজার্চনায় এত ঐক্যবদ্ধ। সান্ধ্যপ্রার্থনার একটা ছোট্ট গান আমি তৈরি করলাম, সান্ধ্য প্রার্থনায় ডাক এবং আমি আমার রীতি ও মঙ্গলাচরণ রূপে শেষ করব সেই প্রার্থনা দিয়ে—

আল্লা-হো-আকবর,...
আহুরা -মাজদা ...
নারায়ণ ...

(ভাষান্তর : মহেশ্বর ভট্টাচার্য)

উৎস : *Religions of the World*, Part-I, 1938

সংযোজন-২

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

গতবারে যখন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি গৌহাটিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একদা কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহার সহিত যে পরমহংস দেবের সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় ছিল, এ কথা অনেক গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছিলাম; তাই কৌতূহলী হইয়াই ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—বিশেষতঃ পরমহংস তাঁহার 'চাপরাশ' আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও যখন রামকৃষ্ণ গলনালীর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন—তখন পীড়াযুক্ত স্থানে মন একাগ্র করিলেই পীড়া সারিয়া যাইবে, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই দুই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরমহংস দেবের ভক্তগণের লিখিত বিবরণ হইতে বিশেষভাবে বিভিন্ন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সামান্যতঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও পরমহংসের ভক্তগণের প্রচারিত গ্রন্থাদিপাঠে তৎসম্বন্ধে যেরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহা হইতে অনেক পৃথক্ রকমের বোধ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—এবং একজন উচ্চদরের সাধু মাহাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া থাকি। তাঁহার ভক্তগণের রচিত জীবন-চরিত ইত্যাদি ছাড়াও অপরের লিখিত পরমহংস-দেবসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি—এমন কি হিন্দুর সাধনশাস্ত্রে ও দেবদেবীতে যাঁদের বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এমন অনেক লোককে আমি পরমহংসদেবের উক্তি ও জীবনচরিত পাঠ করিতে বলিয়াছি কেহ কেহ তদ্দ্বারা ফলও পাইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায়

প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক—এই অভিপ্রায়ই এই প্রবর্ত্তনার কারণ।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে পারি নাই—তাই সেদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, আমার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশিত করা গেল।

পরন্তু আগে পূর্ব্বপক্ষ সম্যক্ না বলিলে উত্তরপক্ষ ঠিক্ বোঝা যাইবে না। তাই রামকৃষ্ণ দেবের ও পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে 'চাপরাশ' ও মনঃসংযোগ দ্বারা রোগশান্তিবিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপেই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে;

"চাপরাশ" সম্বন্ধে কথা।

"একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্মুখস্থিত ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেবের আগমন হইয়াছিল। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। আমরা সকলেই পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছিলাম। আমাদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, "হ্যাঁ গা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার চাপরাশ আছে?" চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না এবং আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় কহিলেন, "দেখ যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওয়ালা আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকের হিসাবে পাহারাওয়ালা স্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া যায়? কেন তাহাকে ভয় করে? কেন তাহার কথা শুনে? পাহারাওয়ালা সামান্য লোক, তাহার বেতন ৩্ টাকা, তাহাকে কেহ ভয় করে না। কিন্তু তাহার যে চাপরাশ আছে, তাহা দেখিয়া লোকে ভীত হইয়া থাকে, যেহেতু চাপরাশ মহাশক্তির পরিচায়ক। সেইরূপ ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে তাঁহার শক্তি কাহার ভিতর না

প্রবিষ্ট হইলে, যে যত পণ্ডিত হউক, যে যত বহুদর্শী হউক, যে যত শাস্ত্রজ্ঞ হউক, যে যত সুবক্তা হউক, কেহ তখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না।" ইত্যাদি * রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মানসিক একাগ্রতা দ্বারা রোগপ্রশমনের কথা।

"শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।" পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৪৫ পৃষ্ঠা।

এখন শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

---

* এ বিষয়টি শ্রীম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, একাদশ খণ্ডে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষতঃ) বর্ণিত আছে; তাহাতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—শ্রীম-মহাশয় বেশ একটু মোলায়েম করিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই জন "সাক্ষাৎ দ্রষ্টা"র বর্ণনায় এইরূপ পার্থক্য হওয়াটা একটু আশ্চর্য্যজনক নহে কি?

এ কথাটাও গ্রন্থান্তরে আর এক রকমে আছে—ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ কথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এ ভাঙ্গা হাড়মাংসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়।" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। ইত্যাদি স্বামী সারদানন্দপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব— পূর্ব্বার্দ্ধ ৭৪ পৃষ্ঠা।

৺সদাশিবঃ শরণং।

বহরমপুর
২৭/৯/২৫ *

পরম স্নেহাস্পদেষু—সানুনয় সমাবেদনমিদং—

মহাত্মন্! † অনেকদিন হল আপনার পত্রখানি পাইয়াছি, উত্তরে অনেক কথা লিখিতে হইবে, তাদৃশ অবকাশের প্রতীক্ষায় এতদিন বিলম্ব হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মহাশয়ের (পরমহংসের) সম্বন্ধে আমি যতটা বিদিত আছি, তৎ-সমস্তই সংক্ষেপে জানাইতেছি। এতদ্দ্বারাই আপনার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের উত্তর হইবে।

রামকৃষ্ণ 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকটেই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুক স্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধহয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পায় †† নাই। এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পায় না, তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন

---

* অর্থাৎ ২৫শে পৌষ ১৩২৭। পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতনরীতি; পাশ্চাত্যের সঙ্গে এখানেও আমাদের প্রভেদ। (লেখক)

† তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত—এবং "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈবশ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"—তাই এই ক্ষুদ্রকেও এতাদৃশ সম্বোধন করিয়াছেন।

†† এরূপ ('পাই' স্থলে 'পায়') প্রয়োগ চূড়ামণিমহাশয়ের জ্ঞানকৃত বলিয়াই মনে হয়।

ছিল্ না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না, তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।

রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেকদিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম তিনিই আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপরে আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধেও তাঁহার নিকট যাইতাম। "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কি না" আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫-৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না; কাজেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যায় নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তিসাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তিরাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।

তাঁহার ভক্তিমাখা গান শুনিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব দেখিতেও আনন্দ হইত। তদ্ব্যতীত তিনি কতটা উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ কুতূহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধুপ্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল।

এই সকল কারণে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতাম। আর তিনি সাধারণ লোকের নিকটে হাসিতে হাসিতে যে সকল টোট্‌কা কথা বলিতেন, তাহাও বেশ মিষ্ট লাগিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি কি কারণে সময় সময় আসিতেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শাস্ত্রের ২/৪টি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা স্মরণ আছে। আর আমাকে তিনি বিশেষ একটু মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এরূপ আমার মনে হইত। আমি ধর্ম্মব্যাখ্যাকার্য্যে ব্রতী ছিলাম তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, মমতার কারণ বোধ হয় তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা সুকঠিন, তবে বাহিরে তাঁহার যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে একজন সাধুপ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ কাটাইয়া আন্তঃরাজ্যের মনোময় কোষ অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিতেন, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। অহঙ্কার, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিও তিনি অনেকটা দমন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সস্নেহে হাস্যমুখে কথা বলিতেন। ভোগ্যবস্তু বিষয়েও তাঁহার আসক্তি অনেকটা কমিয়াছিল, ইহা আমার ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি একশ্রেণীর অবধূত, সে অবস্থায় প্রসাদ মৎস্য মাংসাদি ভোজন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু খাইতেন কি না তাহা আমার স্মরণ নাই।

তবে রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান এবং বারম্বার পান খাওয়া দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেই থাকিতেন, সেখান মা-এর নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোজ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ খাইতেন। তৎপর তাঁহার গুণগরিমা সাধারণে প্রকাশিত হইলে, অন্যলোকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে

দিত, বাড়ী আনিয়াও অনেকে খাওয়াইত। সুতরাং আহার তাঁহার উৎকৃষ্ট মতই হইত, বাসস্থানও উৎকৃষ্টই ছিল। অতএব তাঁহার টাকাকড়ির কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহা নিতেনও না। এ কারণে তাঁহাকে একটি উন্নত পুরুষ অবশ্যই বলিতে হইবে। স্বয়ং গান করিতে করিতে কিংবা অন্যের গান অথবা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলে কিছুকালের মত তাঁহার একপ্রকার সমাধির মত অবস্থা হইত, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, কিয়ৎকাল পর আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এই সমাধির ভাব তাঁহার মনোরাজ্যে থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে। কারণ তিনি ঈশ্বরের রূপগুণেই মগ্ন থাকিতেন, তাহার উপর নহে। রূপানুভূতি মনোরাজ্যেই হইয়া থাকে, ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে, অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য প্রকার স্তর আছে; সমাধিরও অসংখ্য অবস্থা আছে; আর সর্ব্বোপরি যে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব বস্তু আছে,—যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না। কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্দ্বারা এই সমাধিকে ঠিক অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অধিক দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্য ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতররূপে জানাতেই, তখন অবস্থাবিশেষে কাহারও কাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। গানাদি শ্রবণেও ইহা দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম, তাহার ৫-৬ বৎসর

বয়স হইতেই খোল করতালসহ কীর্ত্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত, ২০-২৫ পল বা অর্দ্ধ দণ্ড পর আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল। তখন সে অতি কুপাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারের আবিষ্কারকগণ ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের মস্তিষ্কের অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক বা সুলোকে তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, কিংবা কোন পানভোজন করিতে দিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাঁহার অনুভবে আসিত। স্বর্ণাদি ধাতব বস্তু স্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল থাকার অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সেই কারণেই গান করা বা শুনাকালে তাঁহার ঐরূপ বাহ্য সংজ্ঞা বিলোপ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞান অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধি-শাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে ঐরূপ অবস্থায় যে তাঁহার মনোময় কোষে সমাধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। তবে তিনি বিজনে বসিয়া কতদূর কি করিতে পারিতেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। তিনি দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে মাস ৫-৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, ‘‘আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ্য বাড়ে; সুতরাং আমি ইহা করিতে

পারিব না।" তাহা হইলেও তিনি যোগশক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোনও বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে, প্রথম ভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে; ইহা সত্য কিনা তাহাই জানিতে বাসনা, নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, আপনি তো ঠিক্ ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? আমি বলিলাম, অন্য কারণ কিছু থাকিলে, আমার অবিদিত; আপনি কুসংসর্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি। তিনি বলিলেন, ইহা তো আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন, আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি। * উহারা যে আমারে ছাড়ে না। এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যেও পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানোর আর কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান হয়।

তাঁহার যোগজ কোনও বিভূতি আমি দেখি নাই; তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়ায়িক শক্তির কার্য্য; ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে।

---

* বোধ হয় কোনও কোনও ব্যক্তির নাম হইবে। চূড়ামণি মহাশয় তাহাদের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই।

ইহার উপদেশের দ্বারায় কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিল। যাহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ-উপকার হিন্দুসমাজের চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইমাত্র যথাজ্ঞান আপনাকে বিদিত করিলাম। আপনি ইচ্ছা করিলে, ইহা যে কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। এই পত্রের প্রাপ্তসংবাদ সহ আপনার কুশলবার্ত্তার অভিলাষ করি। অত্র মঙ্গল ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীশশধর শর্ম্মণঃ।

পণ্ডিতপ্রবর তর্কচূড়ামণি মহাশয় রামকৃষ্ণ দেবকে ‘‘পরমহংস’’ লক্ষণাক্রান্ত না দেখিয়া তাঁহাকে ‘অবধূত’ বলিয়াছেন; ‘অবধূত’ যে ‘পরমহংস’ অপেক্ষা কম কিছু, তাহা মনে করা অনুচিত—‘‘অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ’’—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কি হইতে পারে?

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন্নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় রামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘‘আপনি কি আমার নমস্য?’’ (রামচন্দ্র দত্ত-কৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—) ৬২ পৃষ্ঠা। *

তারপর রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ সম্বন্ধেও তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে; কেননা তিনি সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এইরূপ মধ্যে মধ্যে অচেতন হইতেন—রামচন্দ্র

---

* কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাতে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত পণ্ডিতপ্রবরকে তীব্র আক্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—ওরূপ ভাব ঠিক্ নহে। মনে রাখা উচিত, কেহই ‘অন্তর্য্যামী’ নহে—বাহ্য আকার আচরণ দেখিয়াই লোকে অপরকে বিচার করিবে—বিশেষতঃ শাস্ত্রদর্শীরা শাস্ত্রের কষ্টিপাথরেই লোককে কষিয়া দেখিয়া তদ্বিষয়ে ধারণা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে আছে, "ঠাকুর-দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন।" (৪ পৃষ্ঠা)

অতএব এইরূপ ভাবাবেশ যোগজাত সমাধি নহে বলিয়াই বোধ হয় *—ইহার অধিক বলিতে আমার অধিকার নাই—তবে ধর্ম্মসাধনে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্য্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে প্রণিধানযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষাবস্থায় পরমহংসদেবের 'কু-সংসর্গ' সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আমরা রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে পাইতেছি,—"তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।" (১৫৪ পৃষ্ঠা) †

মোটের উপর চূড়ামণি মহাশয় রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনুকূল ভাবই পোষণ করিতেছেন,—তবে তাঁহার ভক্তগণ যে সকল শক্তিমত্তা তাঁহার উপর আরোপ করেন—সেগুলি চূড়ামণি মহাশয় অনেকটাই স্বীকার করেন না। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। অথচ শ্রদ্ধাসহকারেই রামকৃষ্ণ দেবের নিকটে যাইতেন। তাঁহার কথাগুলি, সুতরাং সমাদরযোগ্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র ও দেব-দেবীতে যখন বিশ্বাস হারাইয়া হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল--তখন যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শে ও উপদেশে সমাজের উপকার হইয়াছিল—পণ্ডিত শশধরের ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা তাদৃশ—এমন কি তদপেক্ষা অধিক উপকার হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ও তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত "বেদব্যাস" পত্রে "সাধুদর্শন" শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাতে

---

* ব্রাহ্মপ্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "পীড়া" বলিয়াছেন—তদীয় আত্মচরিতে আছে তদ্ভিন্ন তাঁহার (অর্থাৎ পরমহংসের) একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিতেন।" (২০৮ পৃষ্ঠা) ইহাকে 'পীড়া' বলা অনুচিত—এবং ইহার "সঞ্চার" হওয়ার কথাটাও ঠিক নয়—রামকৃষ্ণের বাল্যাবধিই যখন এরূপ ভাব দেখা যাইতেছে।

† কৌতূহলী পাঠক "জীবন বৃত্তান্তে"র এই প্রসঙ্গটি সমগ্র পড়িয়া দেখিবেন।

ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে রামকৃষ্ণেরও প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় সর্ব্বদাই রামকৃষ্ণদেবকে আদরের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। *

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ভক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি—অবশ্য তাঁহার ন্যায় সাধু মহাত্মার সম্বন্ধে কথা বলার আমি নিতান্তই অনধিকারী। তথাপি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি কথা এ-স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীভগবতীর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই হইতেছে—এই যে রামকৃষ্ণ দেবের বঙ্গদেশের রাজধানীর সন্নিকটে আবির্ভাব, তাহাও তাঁহার একটা বিধান। সনাতন ধর্ম্মের যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—সাকার উপাসনার—তথা ধর্ম্মসাধনের সনাতন রীতির প্রতি যখন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের অনাস্থা হইতেছিল, তখন অনেকগুলি বিষয় মহামায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী কৃপায় সংঘটিত হইয়াছিল—রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ও তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার উক্তি ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি এই জন্মিয়াছে যে, তিনি সাধনভজনাদি শাস্ত্রানুসারে করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ

* এ-স্থলে অপর একজন অতিবিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়ের কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই, তৎসময়ে পূর্ব্বদিন আমার জনৈক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় —মহোদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাপু, হে, লোকটি বেশ চতুর ছিলেন, কিন্তু তুমি যে বল, তিনি ভগবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন, এ সব বাজে কথা—এমন যে পূর্ণানন্দ পরমহংস—তিনিও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কেননা তাঁহার গ্রন্থে 'এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে', এরূপ সন্দেহ আছে, যাঁর ভগবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁর সন্দেহ থাকিবে কেন?" উত্তরে বলিয়াছিলাম—"মহাশয় যে দেবতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ডাকিলে বা ঈদৃশ কঠোর তপস্যা করিলেও দর্শন করা যায় না, এমন দেবতা আমি মানি না—পূর্ণানন্দের যে স্থলে সন্দেহ বলিতেছেন, তাহা যদি এমন হয় যে, এটা ওটা উভয়টাতেই ঈপ্সিত বিষয় সমানভাবেই বিদ্ধ হইতে পারে, তাহলে?" পণ্ডিত মহাশয় এই অজ্ঞকে হঠাৎ প্রাজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতে দেখিয়া বোধ হয় "মৌনমত্ব হি শোভনম্" মনে করিয়া আর তর্ক বাড়ান নাই।

দিয়াছেন—তাহা শাস্ত্রের বিধির অনুযায়ী—এই সনাতন ধর্ম্মের পোষক। তাঁহার কথায় ও আদর্শে অনেকের স্বধর্ম্মে আস্থা হইয়াছে—ইহাতে সনাতনধর্ম্মের উপকার হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ-মধ্যে অনেকে সনাতন রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নানা উপদেশ প্রচার করিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে 'অবতার' সাজাইয়াছেন—তাঁহারা অপর সাধু মহাত্মগণের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, 'অবতার' না হইয়াও তাঁহাদের বর্ণনানুরূপ (যাহাতে বহু কথা অতিরঞ্জিত আছে) মনুষ্য ভারতবর্ষে অনেকেই ছিলেন। ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী বামাক্ষেপা, রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি বহু মহাত্মা ভারতের নানাস্থানে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণকে চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণের যাঁহারা মন্ত্রশিষ্য—তাঁহাদের গুরুদেবকে ভগবান্ মনে করা খুবই সঙ্গত—কিন্তু 'অবতার' বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে সে, রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু 'অবতারের' আবির্ভাব হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভটশ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবতারবাদীরা শ্রীচৈতন্যের অনুকরণে রামকৃষ্ণের 'লীলা' প্রচার করিতেছেন—ইহাতে শ্রীচৈতন্যেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইতেছে। * তারপর বিবেকানন্দ 'হাঁড়ি-ধর্ম্ম', 'ছুৎমার্গ' ইত্যাদি বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, জানি না, আজ রামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিলে তিনি শুনিয়া কি বলিতেন? লোকে যা' তা' খাউক, যার তার পাত চাটুক—এরূপ উপদেশ তাঁহার উক্তি বা আচরণে কোথাও পাইয়াছি

* 'চৈতন্যভাগবতা'দি পড়িয়া জনৈক ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল, মহাপ্রভু একজন অবতারই হইবেন—তাই জন্মাষ্টমীর ন্যায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এ-সকল জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার মনে হইল—যাহা ইদানীং ঘটিতেছে—৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছিল—অর্থাৎ ভক্তেরা অত্যুক্তিপূর্ণ কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি এখন আর ঐ তিথিতে উপবাস করেন না।

বলিয়া তো মনে হয় না। রামচন্দ্র দত্ত-রচিত ''জীবনবৃত্তান্তে'' আছে—''তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন।'' (১৩২ পৃষ্ঠা) ফলতঃ সাধু মহাত্মারা শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিবেন—বা তদনুরূপ আচরণ করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। * বরং অবস্থাভেদে সাধারণের আচার আচরণ হইতে উদাসীন অবধূত কোনও সাধু বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান করিলেও তাহা গর্হিত হইত না—তথাপি রামকৃষ্ণ পরমহংস ওরূপ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো দেখা যায় না। বরং তিনি বলিতেন, ''আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি—ওরা দৌড়িয়ে মুতিবে!'' তাই নিজের আচরণের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন।

সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ যে সকল কথা বলিয়াছেন—এবং তিনি যে ভাবে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয় ইতোধিক কিছু বলা এ-স্থলে অনুচিত মনে করিতেছি—ইচ্ছা আছে প্রবন্ধান্তরে এতদ্বিষয় আলোচনা করিব।

উৎস : *সাহিত্য*, পৌষ ও মাঘ, ১৩২৭।

---

* 'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থাবলীতেও এমন দেখা যায় না যে, তিনি 'সবলোট' হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পুরীতে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই—তথাপি সেখানেও চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। অথচ তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং বর্ণভেদের অতীত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও
পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি (প্রতিবাদ)

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—... আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি... এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক"—ইত্যাদি ভূমিকা সহ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একখানা পত্রে নিজের মন্তব্য সহ যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন; উহা বিগত ১৩২৭ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়, পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণার বিষয় অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। পত্রখানির তারিখ দৃষ্টে বুঝা গেল, ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা। "পরমহংস মহাশয়" সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভিমত মোটামুটি, এই :

(১) "রামকৃষ্ণ, পরমহংস নহেন। কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পায় নাই। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না। তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে "অবধূত আশ্রমী" বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার মতে তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।"

ইহার উত্তর এই—চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ উল্লেখ করেন নাই। আমরা জানি 'অবধূত', 'পরমহংস' ও 'স্থিতপ্রজ্ঞ'

ইহার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ইহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। পরমহংসগণ যে লিঙ্গ চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা পরমহংসোপনিষদ পাঠ করিলেই জানা যায়। শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের লক্ষণ যে চূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই; ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেননা ঐ তিন আশ্রমই তিনি পরপর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিয়াই তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। চূড়ামণি মহাশয় নিশ্চয়ই 'বিবেকচূড়ামণি' পাঠ করিয়াছেন; অতএব 'শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামত' পরমহংসের লক্ষণ তিনি উহাতে প্রচুর পরিমাণই পাইয়াছেন, এবং একটু অবহিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের আচরণের সহিত উহা মিলাইয়া লইলেই পারিতেন। সম্ভবতঃ স্বীয়মত ও ধারণা সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সাধারণের নিকট যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবী করেন; যদি সাধারণ অন্য কোন অভিজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মত ও ধারণার প্রতি সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আশা করি পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুব্ধ হইবেন না। অতএব তাঁহার 'বিবেচনা' যদি সকলে মানিয়া না লয়, তাহা হইলে 'নিতান্ত অসঙ্গত হয় না'।

(২) ''ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কিনা''—আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, করেনও নাই, তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫-৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না; কাজেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর নীরব থাকিয়া ''চাপরাশ আছে কি না?'' ইহার প্রতিবাদ করিবার মূলে যে গোপনীয় কারণ আছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কোন কৌতূহল নাই। তবে আশঙ্কা হয়, ঐ প্রশ্ন স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, (পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত) এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ

কালের ব্যবধানেও জীবিত আছেন; এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন। প্রশ্নটি এমন কিছু গ্লানিকর নহে, অথবা উক্ত প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা লাঘব হইবারও কোন কারণ ছিল না। উদ্ধৃত দ্বিতীয় আপত্তিটি চূড়ামণি মহাশয় যে ভাষায়, ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত এখনো তাঁহার স্মৃতিশক্তি অব্যাহত আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। যিনি বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভু মল্লিক, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমবাবু ইত্যাদি অনেকের সম্মুখে নির্ভীক মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; তাঁহার পক্ষে চূড়ামণিমহাশয়কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কেন সম্ভবপর হইবে না, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরমহংসদেবের কথা দূরে থাক্, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ পণ্ডিত মহাশয়কে 'অপাত্র' মনে করেন না, অথচ এক অমূলক আশঙ্কায় পণ্ডিতজী নিজেকে সুপাত্র প্রমাণ করিবার জন্য কেন অধীর হইলেন? আর ঐরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার পণ্ডিতজী তাঁহাকে না দিলেও, তিনি উহা এমন স্থান হইতে পাইয়াছিলেন, যেখানে পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধা অভ্রভেদী হইয়া উঠিলেও, পৌঁছিতে পারে না। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় এবং তাঁহার আমমোক্তার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যে ভাবে অন্যান্য 'প্রত্যক্ষদর্শী'কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা সে ভাবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে লজ্জা দিব না।

(৩) ''তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তিসাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না।... যে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না।"

পাণ্ডিত্যের অন্ধ অহঙ্কার ও তৎপ্রসূত ঈর্ষা কেমন করিয়া বিচারবুদ্ধিকে অতি সহজেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এই-তৃতীয় সিদ্ধান্তটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে 'সাধারণব্যক্তি' প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ হাস্যকর ব্যবস্থাপত্রের অবতারণা করিতে পণ্ডিতজী একটুও সঙ্কুচিত হন নাই; ইহা আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক। কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠেই

ঐ সকল দুরূহ তত্ত্ব ধারণা হয় না, আমরা জানি। কিন্তু কেবলমাত্র গুরু উপদেশে ঐ সকল তত্ত্বের ধারণা সম্ভব, এবং হইয়াছে, এমন প্রমাণ শাস্ত্রে অবশ্য প্রচুরই আছে। দর্শন ও উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হয়, তবে 'হস্তামলক' সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর মত কি? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীর প্রমাণ ভূরি ভূরি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—নাই বা করিলাম। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয়, সে জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। পণ্ডিতজীও যখন শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তখন আমরাও করিলাম না। রীতিমত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যে সমস্ত পণ্ডিত আজও সংসারের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, শাস্ত্রমতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া যিনি আরও সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের নানা সম্বন্ধে জড়িত, তাঁহার নিকটও ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় কোন মুমুক্ষু জানিবার আশা করেন না।

(৪) পণ্ডিতজীর, মতে পরমহংসদেবের সমাধি হইত না। যাহা হইত, তাহা নাকি, পণ্ডিতজীর এক শিষ্যেরও হইত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। কেননা পরমহংস তো লেখাপড়া জানিতেন না; অতএব "যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে-সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না"—ইহাই পণ্ডিতজীর সিদ্ধান্ত। ইহাও তৃতীয় সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীকে যখন পণ্ডিতজী প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন আর যুক্তির আবশ্যক কি? 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—অতএব তর্ক নিরর্থক। তবে পণ্ডিতজী রামকৃষ্ণের সমাধি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল করিতেন। মরণের প্রাক্কালেও দাম্ভিকতাটা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না—দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়!

অপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টীকাটিপ্পনীগুলির উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ হয়। এত স্পর্দ্ধা, এত অসঙ্গতি, এত কুৎসিত প্রয়াস কেমন করিয়া সাহিত্যের অঙ্ক কলুষিত করিল? বঙ্গবাণীর এই পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে এই ন্যাক্কারজনক আবর্জ্জনা নিক্ষেপের অপরাধে শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর ভাষায়

'সাহিত্যের নৈতিক আদালতে বেত্রদণ্ড' পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালার এই সব সনাতন পন্থিগণের কদর্য্য অভ্যাস ও প্রবৃত্তিগুলিও কি চরিত্রের মধ্যে সনাতন আসন পাইয়াছে? বিচক্ষণ সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের এই সমস্ত হীন চেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসসম্বন্ধে তিনিও সবিশেষ অবগত আছেন; এবং তিনি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী। অতএব প্রতিবাদটা তাঁহার করাই উচিত ছিল।

উৎস : *সাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

রামকৃষ্ণ পরমহংস (সমালোচনা)

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৌষ ও মাঘ মাসের সাহিত্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়-লিখিত একখানি পত্র ছাপা হইয়াছিল। ঐ পত্রে পণ্ডিত মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন সাধুপ্রকৃতির লোক বটে, কিন্তু তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না, তাঁহার সমাধিও হইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তিসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, "আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে যায় (যাই) নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্ম বিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না।" অতএব পণ্ডিত মহাশয়ের মতে শাস্ত্রপাঠ না করিলে অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদি কিছুই জানিতে পারা সম্ভব নহে। ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় বা ঈশ্বর লাভের পথ নির্ণয়ের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান মূল্যবান্ সহায়ক, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান না হইলে—কিংবা শাস্ত্রপাঠ না করিলে যে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বা তাঁহাকে লাভ করিবার পথ কি, তাহা জানা যায় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এ-কথা নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বরং ইহার বিপরীত কথা বহুস্থানে দেখা যায়। 'গীতা'য় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।। [১১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক]

"বেদ ও যজ্ঞ, বিদ্যা, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা তোমা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি আমাকে এ ভাবে দেখিতে পারে না।"

পুনশ্চ,

"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টাবানসি মাং যথা।।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।"

[১১ অধ্যায় ৫৩ ও ৫৪ শ্লোক]

"তুমি আমাকে যে ভাবে দর্শন করিলে বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ দ্বারা আমাকে সে ভাবে দর্শন করা সম্ভব নহে। অনন্য ভক্তি দ্বারা আমাকে এই ভাবে জানা যায়, দর্শন করা যায়, ও আমার তত্ত্বে প্রবেশ করা যায়।" অতএব ভগবান্‌কে জানিতে হইলে, তাঁহার তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন—তাঁহাতে অনন্যা ভক্তি,—অপর কোন বিষয় ভজনা করিলে চলিবে না, সাংসারিক সুখ আশা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, কামনা বিসর্জ্জন দিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠ করা উত্তম এ জন্য যে, শাস্ত্রপাঠ করিয়া ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় এবং ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিবার উপায়ও কিছু জানা যায়। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও ভগবান্‌কে একমনে ডাকা সম্ভব, অতএব ভগবৎতত্ত্ব জানা সম্ভব। কেহ কেহ সাধুপুরুষের উপদেশ লাভ করিয়া, কেহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে স্বতঃই ভগবানে একান্ত অনুরক্ত হইয়া একমনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন এবং এইভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। পরন্তু শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যাহারা একমনে ভগবান্‌কে ডাকেন না, তাঁহাদের ভগবৎতত্ত্ব-জ্ঞান বা ভগবান্ লাভ হয় না, তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠ

নিরর্থক। এজন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অধ্যয়নের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

ভগবান্‌কে লাভ করিয়া কি প্রকারে মনুষ্যজীবন সার্থক করা যায়, তাহা গীতায় অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো যদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবেষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।" [১৮।৬৫]

"আমাতে তোমার মন নিবিষ্ট কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। (এই উপায়ে) তুমি আমাকে পাইবে। আমি তোমাকে সত্যপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—যে হেতু তুমি আমার প্রিয়।"

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।" [১৮।৬২]

"তুমি সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের শরণ লও। তাহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইবে। (অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করিবে)।"

"মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং য়েন মামুপযান্তি তে।।" [১০।৯, ১০]

"মদ্ভক্ত পণ্ডিতগণ আমাতে প্রাণ ও চিত্ত সমর্পণ করে, পরস্পরকে আমার বিষয়ে বুঝাইয়া থাকে, সর্ব্বদা আমার কথা কহিয়া থাকে, —ইহাতে তাহারা সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করে। এই সকল ব্যক্তি সতত আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখে, আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি,—যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে।"

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।। ৮।১৪।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবেষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৯।৩৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। [১১।৫৫]
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। [১৮।৫৫]

সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে যে, ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়।

ভগবানের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়, অতি দুরূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন,—

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

পুনশ্চ,—গুহাস্থিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।

কিন্তু ভক্তিদ্বারা যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদে এই দুরূহ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। এজন্য শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ বা অসম্ভব। উপনিষদও এ-কথা বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"

"এই আত্মা (ঈশ্বর) উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ইনি যাহাকে বরণ করেন (কৃপা লাভের উপযুক্ত মনে করেন) সেই ইঁহাকে লাভ করে; তাহার নিকট ঈশ্বর নিজরূপ প্রকাশ করেন।"

অতএব তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে বলিয়াছেন, "তিনি (পরমহংসদেব) কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তি সাধনাদিবিষয় কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না"—এ কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ধ্রুব বা প্রহ্লাদ ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বর লাভ করেন নাই। নারদ একজন দাসীপুত্র ছিলেন, ব্রাহ্মণমুখে কিছু ঈশ্বরকথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, রীতিমত শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও তিনি কিরূপে ঈশ্বর লাভ করিলেন?

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, "তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়ম অনুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার কিছুকাল পরে হঠাৎ তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্দ্বারা এই সমাধিকে ঠিক অনুষ্ঠানের ফল বলা যায় না। ইহা

মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব।" নিয়ম অনুসারে না হইলেই যে তাহা প্রকৃত সমাধি নহে, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। নিয়ম সাধারণের জন্য, যাহারা অসাধারণ, তাদের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। বিলাত যাইবার সাধারণ নিয়ম এই যে, টিকিট ক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টিকিট ক্রয় করিতে হয় না, তাঁহাদের ইচ্ছামত গিয়া জাহাজে উঠেন। সমাধিলাভের নিয়ম সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধারণ লোকের মনের বন্ধন এত বেশী যে, সে বন্ধন কাটান অতিশয় কঠিন ব্যাপার, তাহাদের জন্য শাস্ত্রকারগণ দয়া করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহারা সে বন্ধন শিথিল করিয়া সমাধিলাভ করিতে পারে। মহাপুরুষদের অন্য কথা। তাঁহাদের ঈশ্বরানুরাগ অতি প্রবল, ঈশ্বরের নামগুণগান শ্রবণেই তাঁহাদের মনে যে প্রবল আবেগ হয়, তাহাতে ক্ষীণ সংসারবন্ধন ভাসিয়া যায়, এবং তাঁহারা সমাধিলাভ করেন। তাঁহাদের সমাধি যে প্রকৃত সমাধি নহে, তাহা মনে করা ভুল। মস্তিষ্করোগের সহিত কিছু বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করা উচিত নহে যে, ইহা মস্তিষ্করোগবিশেষ। যাহারা সনাতনধর্ম্মে আস্থাহীন, তাহারা নিয়মপ্রাপ্ত সমাধিকেও মস্তিষ্কের বিকার বলে; কারণ উভয় অবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পায়। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতকেও এই অসার যুক্তিপদ্ধতি গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

সমাধির কথা বলিয়া চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, "সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না।" সেই এক কথা! শাস্ত্র পাঠ না করিলে এ-সকল বস্তু জানা সম্ভব নহে। কেন সম্ভব হইবে না? যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহাদের ত কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। কারণ দর্শন উপনিষদ এবং অন্য যাবতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্",—এ-সকল সেই পরমপুরুষের নিঃশ্বাস মাত্র, তাঁহাকে পাইলে আর কিছুই জানিতে বাকি

থাকে না। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন, ‘‘যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতাং বিজ্ঞাতম্।’’

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন, ‘‘তিনি দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে মাস ৫।৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দরুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না।’’ মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে যে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কেন সে সকল যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, অন্য মহাপুরুষের জীবনেও এ সকল দেখা যায়। সীতাকে হারাইয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত করুণভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং ভগবান্, লীলায় নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই সীতাহরণ নিবারণ করিতে পারিতেন, সীতাহরণ হইলেও তিনি চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেন। কিন্তু প্রাকৃত মানবের ন্যায় দুঃখভোগ করিলেন কেন, তাহা বলা কঠিন। হয়ত তিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মানবসুলভ দুঃখকষ্টও ভোগ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবেরও বোধ হয় দৈহিক কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়াই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল না।

চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছেন,—‘‘ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কিনা’’ আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমি তাঁহাকে দেয় (দেই) নাই।’’ ইহার ভাবার্থ এই যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিরক্ষর ছিলেন, আমি একজন পণ্ডিত ছিলাম, ওরূপ প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার অপমান করিতে সাহস করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, পরমহংসদেব শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন। ধনী, উচ্চপদস্থ, বা পণ্ডিত বলিয়া তিনি কাহাকেও সমীহ করিতেন না। যাহার বিষয়ে যাহা মনে হইত, তাহাই সরলভাবে বলিতেন। সুতরাং তাঁহার এরূপ কথা মনে হইলে চূড়ামণি মহাশয়ের অধিকার দিবার অপেক্ষা রাখিতেন না। তবে বাস্তবিক বলিয়াছিলেন কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রবন্ধের উপসংহারে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মত সমর্থন করিয়া কোন যুক্তি না দিয়া নানা অপ্রাসঙ্গিক

কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ''অবতার বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে।'' বঙ্গদেশে আধুনিক বহু অবতারের কথা আমরা ত শুনি নাই। উপরন্তু এই যে আপত্তি, ইহা ত শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বলরাম প্রভৃতিকে অবতার-বলার-বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়,—এবং ব্রাহ্মরা করিয়াও থাকেন। পদ্মনাথ বাবু বলিয়াছেন, ''রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন'' : ইহা যথার্থ নহে এবং এ সম্বন্ধে উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করা অনুচিত হইয়াছে পরমহংসদেব অবতার ছিলেন কিনা, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব না। আমরা শুধু ইহাই বলিব যে, ভবিষ্যতে কল্কি অবতার ভিন্ন অন্য অবতার হইতে পারে না, ইহা অনেকের ভ্রান্ত ধারণা। অবতার বহুসংখ্যক, সকল অবতারকে সকলে চিনিতে পারেন না। কারণ 'গীতা'য় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

''বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥''
পুনশ্চ,
''যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥''

উপসংহারে আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, কেহ যদি কোন সাধুপুরুষকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তথাপি সাধুপুরুষ বলিয়া তাঁহার অসম্মানসূচক কথা বলা উচিত নহে।

উৎস : *সাহিত্য*, আষাঢ়, ১৩২৮।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি

পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

বিগত ১৩২৭ সালের পৌষ-মাস যুগ্মসংখ্যক ''সাহিত্য'' পত্রে ''রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি-শীর্ষক'' একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কতদূর কি ছিল, এই বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয় কতগুলি কথা বলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত ঐ সব কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ মৌখিক আলাপে, কেহ চিঠি দিয়া এবং অপরে (স্বনামে এবং বে-নামেও) প্রবন্ধ লিখিয়া স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইহাদের উক্তির অধিকাংশই গালাগালি ও বাজে কথায় পরিপূর্ণ, তথাপি যে সকল কথাতে কিঞ্চিৎ যুক্তির আভাস আছে—বিশেষতঃ রাঁচির শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (*সাহিত্য*, আষাঢ়, ১৩২৮) যে সকল শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা রহিয়াছে, সেইগুলির প্রতি আমি শ্রীযুত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। অপিচ, চূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ''বেদব্যাসে'' পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—সেগুলি পশ্চাৎ সংগ্রহ করিয়া * পাঠ করাতে দেখিলাম, তন্মধ্যে উল্লিখিত কতকগুলি কথা চূড়ামণি মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত অভিমতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি ঐ সকল কথার প্রতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করি, কেননা তথ্য প্রকাশই আমার অভিপ্রায়।

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি যে প্রশ্নগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম—তাহা প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ''বেদব্যাস'' পাঠের স্মৃতি মাত্র।

অনুষ্ঠান মধ্যে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আর উপনিষদ্ অধ্যয়ন এবং মননশাস্ত্র শিক্ষার পর যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া যে গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা করার উপদেশ শাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রলাপ মধ্যেই পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতোক্ত ভক্তিও কেবল সত্ত্বশুদ্ধিরই কারণ এবং সত্ত্বশুদ্ধি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির কারণ, ইহা ভাগবতেই (২য় প্রথম স্কঃ) লিখিত আছে। এজন্য ভাগবতও অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার কথায় পরিপূর্ণ সুতরাং ভাগবতের মতেও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি জীবকে কৃতার্থ করিতে পারেন না। অনধীতশাস্ত্র কোন লোক যে, অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, এ-পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্তও নাই। সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করা মাত্রেই যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা তাহাদের পরিচয় না থাকিলে, সে কোন্‌টি ধরিবে, কোন্‌টি না ধরিবে, সে ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে গেল, কি অন্য তত্ত্বের দিকে সরিয়া পড়িল, এবং তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হইতেছে, উহা কোন্ লক্ষণের অন্তর্গত, কিংবা উহা সত্য বা ভ্রমদর্শন, ইহা কি প্রকারে বুঝিবে? তবে যদি গুরু তৎসমস্তই শিষ্যকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সাধক যথানিয়মে উঠিতে পারে, ইহা সত্য; কিন্তু সেরূপ শিক্ষা তো অধ্যয়নের নামান্তর। তাহা ২/১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আর নিরক্ষর লোকের অত কথা মনে রাখাও সম্ভবপর নহে; কাজেই শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আজকাল এমন গুরুর অসদ্ভাব নাই, যিনি ৫্ টি টাকা দক্ষিণা পাইলেই অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে ভ্রূর ঊর্ধ্বভাগে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ব্রহ্মদর্শন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনে কোনরূপ অধ্যয়নেরই প্রয়োজন নাই। উহা অন্ধগণেরই ব্রহ্ম এবং তাহাদেরই সন্তোষাবহ। ঐ শ্রেণীর গুরু এবং ঐ শ্রেণীর শিষ্যগণই শাস্ত্রাধ্যয়ন বা জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী এবং তাহারাই আত্মসম্মান বা আত্মতুষ্টি রক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাদির অকিঞ্চিৎকরতা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, রীতিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত জীবের ব্রহ্মরাজ্য বা অধ্যাত্মরাজ্যে আরোহণ করা গগনকুসুমের ন্যায় অসম্ভবপর।

তান্ত্রিকভাবের সন্ন্যাস দেওয়াও সত্য হওয়াই সম্ভব, এবং সেইজন্যেই তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার চিতারোহণাদি অনুষ্ঠান এবং আমার পূর্ব্বলিখিত তাঁহার অন্যান্য আচরণ সেই বিষয়েরই প্রমাণ করে। তদনুসারে তাঁহার গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি হইতে পারে অথবা হইয়াছিল। 'পরমহংস' সেরূপ কোন উপাধি নহে, উহা সর্ব্বত্যাগী শেষাশ্রমীর সংজ্ঞা। রামকৃষ্ণের সেরূপ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে পরমহংস বলা ঠিক্ নহে। তবে দশজনে যখন পরমহংস বলে, আমিও তাহার অনুকরণে পরমহংস বলিতাম, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। অবধূত আর পরমহংস কথার অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রায় এক হইলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী আর বন, পর্ব্বত, সাগর, এই ছয়দলের তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণের অবধূত সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুরীর শিষ্য, সুতরাং তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত, ইহা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু অবধূত 'গীতা'র প্রকৃত অবধূত নহেন। তৎকালের ''বেদব্যাস" পত্র বা ''সাধুদর্শন" আমার নিকট নাই বা পাইবার উপায় নাই; সুতরাং তাহা আমার দেখা অসম্ভব। রামকৃষ্ণের ভক্তিগদগদ অপূর্ব্বভাব দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতাম, ইহা এখনও বলিতেছি এবং উহা যে অসাধারণ, তাহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত, ইহা আমি কখনও বলি নাই, ইহা নিশ্চয়।

''বেদব্যাসে" আমার যে সকল কথা প্রকাশিত হইত, তাহাই আমি দেখিতাম। ভূধর বা অন্যের লেখা দেখি নাই বা অনুসন্ধানও করি নাই। * আমি 'বেদব্যাসে'র সম্পাদক ছিলাম না।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরুর নিকট দুই চারিটি কথা শুনিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, অথবা ধ্বনি হইতে পৃথগ্ভূত ভক্তিনামক কোন কিছুর দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে অধ্যাত্মতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা নিরর্থক বা উন্মত্তের

* *বেদব্যাস*, ৩য় বর্ষ, ১ম অধ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২য় পৃষ্ঠায়) ভূধর চট্টোপাধ্যায় এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

উত্তরে চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যে চিঠিখানি পাইয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

৺সদাশিবঃ

শরণং

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার ৩০শে শ্রাবণের পত্রখানা যথাসময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন আমার দৌহিত্রীটি টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত থাকায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম, আবার সে একটু সুস্থ হইলে নিজেও অসুস্থ হইয়াছিলাম। এজন্য আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রতি ৺কৃপায় সে সব ঝঞ্ঝাট্ সারিয়াছে, তাই অদ্য উত্তর দিতেছি,—

লোকের তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে যাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহা তাহার মুখ আর হৃদয়েই থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার বা আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহাত্মা রামকৃষ্ণ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিদিত করিয়াছি। তাঁহার মহিমার লাঘব করিবার মানসে কিছুই লিখি নাই; সুতরাং আমার ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি।

ভূধর চট্টোপাধ্যায় আমার দীক্ষিত শিষ্য, ছাত্র নহে। ভূধর আমার বা অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। যথাসম্ভব অনুবাদাদি পাঠেই সাধারণভাবে ভূধরের কিছু জ্ঞান ছিল। অতএব নির্ব্বিকল্প সমাধি, সবিকল্প সমাধি ভূধরেরও বিদিত ছিল না। যেটুকু বিদিত ছিল, তদনুসারেও রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধির উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং দিবসত্রয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, একথা লিখিত হয় নাই। রামকৃষ্ণের প্রথম অবস্থায় ভূধরের শৈশবকাল ছিল। সুতরাং সে স্বয়ং তাঁহার সে অবস্থার কিছু দেখে নাই। তাঁহার নিজের মুখেও সে একথা শুনে নাই। অন্য লোকের মুখেই শুনিয়া লিখিয়াছে। সাধারণ লোকেরা কতজনেই কত কিছু কথা বলে, সে সকল কথার যথেষ্ট মূল্য দিলে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তবে তিনি তোতাপুরীর নিকট দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এ-কথাটি মিথ্যার গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করা অসঙ্গত। তদানীন্তন অনেক লোকেই একথা বিদিত ছিলেন। তাঁহাকে

আমি একথা কখনও ভাবি নাই যে, যথারীতি যোগানুষ্ঠানাদি না করিয়া বিবেকবৈরাগ্যাদিশূন্য লোকের কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই কৃতার্থতা হয়; কিন্তু শুভাদৃষ্ট থাকিলে শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বীজ সমাধি হইয়া কৃতার্থতা হইতে পারে, অজ্ঞের পক্ষে তাহা অসম্ভবপর, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

কি অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ, কি শাস্ত্রীয়বিদ্যা, ইহার কোন বিষয়েই আমি আমাকে, ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা উচ্চলোক বলিয়া এখনও মনে করি না। বরং বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদিরই অনুভব করিতেছি। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদেবতার কৃপার নিমিত্ত নানাদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছি, একথা সত্য এবং যাঁহারা তাহা করেন নাই, তাঁহাদের তুলনায় এ অংশে আমি একটু অগ্রসর। আর তাঁহারা সেই অরণ্য হইতে দূরে অবস্থিত, এরূপ ধারণা যদি দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কারের নামান্তর হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি এ অংশে অপরাধী। কিন্তু শাস্ত্র এ ধারণাকে তাহা বলে না। শাস্ত্রমতে ইহা স্বরূপ জ্ঞানমাত্র। যে ভাবটি অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া নিজেকে স্ফীত করিয়া তোলে, তাহাই অহঙ্কার বা দম্ভাদির অন্তর্গত। অতএব, "আমি ৪৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছি, আর রামকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, ইহা তাঁহার বিদিত ছিল" এইরূপ বলা শাস্ত্রের মতে দাম্ভিকতাদিমূলক নহে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীশশধর শর্ম্মা। *

এই চিঠি পাইয়া শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণিকে মহাশয়কে আমরা দু-একটি জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের প্রভূত সুকৃতি থাকিলে পরজন্মে সাধক স্বল্পকাল মধ্যেই অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন—যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব প্রভৃতি হইয়াছিলেন; রামকৃষ্ণ পরমহংসও হয়তো সেইরূপ কারণেই অত্যল্প সময়ের সাধনায়ই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? অপিচ

* চিঠিখানিতে তারিখ নাই; ইহা ২রা আশ্বিন (১৩২৮) আমার হস্তগত হইয়াছিল।

তদীয় পত্রের শেষাংশে চূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন, ''বাদ্ধর্ক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদির অনুভব করিতেছি;" ইহা তাঁহার বিনয়াতিশয় মনে করিয়া, পত্রখানি প্রকাশ করিবার সময়ে, ঐ বাক্যটি ছাড়িয়া দিতে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এ সকলের উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় আর একখানি চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও এ-স্থলে প্রকাশ করা গেল। *

৺সদাশিবঃ
শরণং

বহরমপুর
২৪/৭/২৮

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা ঝঞ্ঝাটবশতঃ এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি এই পত্রে যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যাহা বিবেচনা তাহা জানাইতেছি :

অবধূত রামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত কি না, তাহা সমর্থন ও অসমর্থন এই উভয় পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নহে; তবে যতটা দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই বলিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি। তবে যদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে, আর সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমানন্দের বিষয়। তিনি শুষ্ক নারদাদির মত মুক্তপুরুষ হইলে বা অনন্ত যশঃকীর্ত্তি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার দুঃখিত হওয়া বা তাহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন কারণ নাই। সমাজে যত বড় লোক হয়, ততই সমাজ ও দেশের উন্নতি, ইহা আমি সম্যক্ বিদিত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জ্ঞানবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহি। রামকৃষ্ণকে আমি কিরূপে জানিতাম, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইত—ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহা

* যাঁহার দ্বারা এ চিঠি লিখান, তিনি বহু বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি করাতে, সংশোধনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশিত হইল।

জানিতাম, তাহা বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাঁহার অনুগত লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। এজন্য এবারও আমার বিশ্বাস অনুরূপ লেখাই লিখিতেছি।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অধ্যাত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই কোন কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাই নাই। তাঁহার কথা বলিয়া, যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত বিষয়ের কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া সে বিষয়ে উপনিষদাদি কোন গ্রন্থ তিনি পড়িতে পারেন নাই, তবে যদি কাহারও উপদেশে ২/১ দিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগানুশাসন আয়ত্ত করিয়া সমাধির অসংখ্য স্তর কাটাইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া কেহ সন্তুষ্ট হন, তবে সে বিষয়ে আমি কি বলিব? তাঁহাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রহ্মবিদ্যাদি ও সমাধিব্যাপারের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে বোধ হয় তাঁহারা সুযোগ পান নাই, সেইজন্য ঐরূপ বলিতে সাহস করিতে পারেন। ধ্রুব বহুদিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রতাদি করিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত আরাধনা দ্বারা ভগবৎকৃপাভাজন হইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারায় মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গবিশেষে (ধ্রুবলোকে) গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেই লিখিত আছে। কিন্তু মুক্তির তুলনায় সে স্বর্গ নরকবিশেষ। প্রহ্লাদও যাবজ্জীবন আরাধনা দ্বারায় স্বর্গবিশেষেই গমন করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিত আছে। শুকদেবও জন্মাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা ও যোগাভ্যাসাদি করিয়াছিলেন, এবিষয় শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে। তাহাতে তাঁহার বশীকার বৈরাগ্য হইবার কথাও পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা লিখিত নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মের শুভানুষ্ঠান থাকিলেও ২/১ দিন মধ্যেই ব্রহ্মবিদা, যোগবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ নির্ব্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহেন, শুকদেবও নহেন। ধ্রুব প্রহ্লাদে যদি সমাধি হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই ঘটনা দ্বারায় প্রতিপন্ন হয়।

যিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি ব্যুত্থানের অবস্থায় ও শারীরিক ও মানসিক পীড়ার দ্বারা পরিবাধিত হন না এবং বাধা-বোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আমি যে ক্রমেই আমার অজ্ঞতা ও নীচতা অনুভব করিতেছি, ইহা লিখিয়াছি, তাহা বিনয় ও ভদ্রতাপ্রকাশের জন্য নহে। উহা আমার বিশ্বাসমতেই লিখিয়াছি। বিদ্যা, মহাবিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি জগদম্বারই নামান্তর। সত্য, অনন্তও তাঁহারই নাম। সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। যে কোন দিক্ দিয়া বিদ্যাদেবীর অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে মানুষ প্রাণের ব্যাকুলতায় কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেজন্য গর্ব্বিতও হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর যখন, অকূল সমুদ্র দেখিতে পায়, তখন সর্ব গর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। তখন বিদ্যাদেবীই যে অনন্ত ব্রহ্মের রূপান্তর, এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয়, সেই সময়ে নিজের অজ্ঞতা না বুঝিতে পারে এমন মানুষ বোধ হয় নাই; কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই পারকূলশূন্য সমুদ্র হইলেও তাহার দিকে অগ্রসর হইতে নিশ্চেষ্ট হয় না। ইহা মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। আমি এখন সেই দশা ভোগ করিতেছি। জগন্মাতা মহাবিদ্যার অন্বেষণের জন্য এক এক দিক্ দিয়া কতকটা কতকটা অগ্রসর হইয়া যতদিন তাঁহার প্রকৃতি সংবাদ কিছুই জানিতাম না, ততদিন তাঁহার চরণসংস্পৃষ্ট এক একটু বায়ুমাত্র দূর হইতে স্পর্শ করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া বৃথা আনন্দানুভব করিতাম। এখন কতক পরিমাণে, হিজিবিজি, কাঁটা জঙ্গল ছাড়াইয়া একটু আলোকের ভাব পাইয়া বিদ্যামূর্ত্তির অসীমতার একটু মাত্র আভাস বুঝিতে পারিয়া, সেই মিথ্যা মন্দ হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর নিজের অজ্ঞতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রাণের ব্যাকুলতাবশতঃ সেই অকূল সমুদ্র লক্ষ্য করিয়াই প্রাণের সর্ব্বশক্তি সমর্পণ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু বিদ্যামূর্ত্তির কোন অংশই পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং আমি অজ্ঞ, ইহা সত্য।

আমি নীচও বটে। যতদিন দৈহিক অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাইতাম, ইহার বাহিরে নিজের জীবাত্মার মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না, ততদিন আত্মবিষয়ে নিদ্রিতবৎ তমসাচ্ছন্ন ছিলাম। সুতরাং আমি ভাল কি মন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই! এখন বহুকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় আবর্ত্ত বা কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অনেক সময় নিজের জীবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। দৈবিক প্রবৃত্তি বা আসুরিক প্রবৃত্তি কি তাহার কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এখন দেখিতে পাই, আমার নিজের জীবশরীর অসংখ্য আসুর বা অপবিত্র প্রবৃত্তির ব্রণগুলি পচিয়া অতি দুর্গন্ধান্বিত ও অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছে। সুতরাং আমাকে আমি অতি নীচ ও অতি দুঃখী ব্যতীত কি বুঝিব?

সত্য কথাই আপনার নিকট লিখিয়াছি। ৺নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমি এই জন্মেই এই ব্যাধিগুলির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পারি। আমি স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে পারি না, ইহা বিদিত আছেন। অন্যদ্বারায় লিখিতে ও পড়িতে হয়; সুতরাং অধিক আর লিখিতে পারিলাম না। এখানে দৈহিক একরূপ কুশল। আপনার কুশলাদি লিখিয়া সন্তোষিবেন, ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশশধর শর্ম্মা

পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই পত্রখানি পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রীক দার্শনিকপ্রবর সক্রেটিস্‌কে যখন ডেল্‌ফির দৈববাণী ''জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ'' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ''দেববাক্য অব্যর্থ, সন্দেহ নাই; তবে আমি একটা কথা জানি যে আমি কিছুই জানি না, অন্যেরা হয়তো ঐটা জানেন না।'' ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন মৃত্যুর প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন ''জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে দু-একটা উপলখণ্ড মাত্র সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি—অসীম অনন্ত রত্নাকর পুরোভাগে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।'' শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌।।

তাই বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যিনি শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মব্যাখা করিতেছেন—যাঁহার সাধনপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইয়াছে, সেই ষড়্দর্শনবেত্তা বিদ্বচ্চূড়ামণি শাস্ত্রাচারপূত বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ স্বকীয় আধ্যাত্মিকী অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রদ্ধার বিষয়—তাহাতেই তাঁহার নিষ্কপট সত্যসন্ধতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক তদুপরি কটূক্তি ব্যর্থ হইতেছে।

চূড়ামণি মহাশয়ের চাপরাশ সম্বন্ধীয় কথার অস্বীকার মিথ্যা বলিতে গিয়া বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, "তবে আশঙ্কা হয় ঐ প্রশ্ন (চাপরাশ আছে কি না) স্বকর্ণে শুনিয়াছেন পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও জীবিত আছেন, এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন।" * সত্যেন্দ্রবাবু যদি যথার্থ সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক হইতেন, তবে সেই জীবিত ব্যক্তিটির নাম-ধাম প্রকাশপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানের উপায় করিয়া দিতেন—তা না করিয়া কটূক্তি বর্ষণপূর্বক নিজেরই পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের ছেলে রামকৃষ্ণ পরমহংস বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বে-আদব ছিলেন না, ইহা নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বসিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর বাসিন্দা ভূধর চট্টোপাধ্যায় ঐ দিনকার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সুধীবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল যে ঐরূপ প্রশ্ন হয় নাই, এমন নহে—তাদৃশ প্রশ্নের কোনও অবকাশই ছিল না। "বেদব্যাস" ২য় খণ্ড (১২৯৪), ১০ম সংখ্যা হইতে ভূধরবাবুর প্রবন্ধের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"একদিবস আচার্য্যদেব (অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি মহাশয়) তাঁহার কলিকাতার আবাসভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনওরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে

* সাহিত্য—১৩২৮। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠা।

দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন, অমনি দেখেন, পরমহংসদেব অচৈতন্য—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এ অবস্থায় অতীত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনের অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমার এমন করে দিলে কেন মা। আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা আমায় ভাল করে দে মা।' এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাই শশধর। দেখ্ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমায় বলিলেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয় গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। আমি চলে এলাম। অনেক দিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল।' এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল; কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাবে ভক্তিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্য দেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন।" *
"বেদব্যাস", ২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড, ২৪০-৪১ পৃ.।

* ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" নামক পুস্তকেও এ সকল কথাই অবিকল আছে, কেননা "সাধুদর্শন" বেদব্যাস প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ মাত্র। মার্জিন দ্রষ্টব্য।

১২৯৩ সালে পরমহংসের তিরোভাব—এই সকল প্রবন্ধ তৎপরবর্ত্তী বৎসরই লেখা হয়। * ভূধরবাবুর প্রবন্ধে পরমহংসদেব সম্বন্ধে তৎসময়ে প্রচলিত অনেক গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ আছে—(প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগ—"বেদব্যাস", ২য় খণ্ড, ১১ সংখ্যা, ২৮৪ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য)। এ অবস্থায় ভূধরবাবুর ন্যায়, রামকৃষ্ণদেবের ভক্তের স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বকর্ণে শ্রুত ঘটনা ও কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। † এখন দেখুন, যিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে "তোমার চাপরাশ আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন সম্ভাব্য কি না? কেশব সেন বা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। পরে উঁহাদের মুখের উপর দু'-একটা স্পষ্টকথা সরলভাবে বলা এক কথা,—আর কোনও দিন জানা শুনা আলাপ পরিচয় নাই—এরূপ দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া "চাপরাশ আছে কি না" প্রশ্ন করা এক কথা, ইহা অভদ্রতা—পরমহংসদেব তাদৃশ ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবে তিনি যে-সব লোকের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, তাঁদের অসাধ্য কোনও কিছুই ছিল না। ইঁহারা কয়েকটি কারণেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। (১) প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ—ইঁহারা ব্রাহ্মণবিরোধী। (২) ইনি সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারক—ইঁহারা বর্ণাশ্রমের তেমন পক্ষপাতী নহেন। (৩) ইনি 'পণ্ডিত'—ইঁহারা পাণ্ডিত্য-বিরোধী—শাস্ত্রের ধার বড় ধারেন না। (৪) ইনি খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার ইত্যাদি সদাচারের পক্ষপাতী ও প্রচারক—ইঁহারা হাঁড়িধর্ম্ম, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি বলিয়া এ-সকলের সম্বন্ধে অবজ্ঞার-ভাব পোষণ

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "কথামৃত" "লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতি ইহার পরে প্রকাশিত হইলেও ভূধরবাবুর এ সকল কথার কোন উল্লেখ বা প্রতিবাদ এগুলিতে নাই। রামকৃষ্ণভক্তরা তাঁহার সম্বন্ধে কোথায় কে কি লিখিল, এ সকলের অনুসন্ধান রাখিলে, ইহাও প্রকাশিত হইত।

† বরং উল্লিখিত পরমহংসদেবের বিবরণীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত-বিরুদ্ধ (যথা 'সমাধি' ইত্যাদি) অনেক কথাও যে আছে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করেন। * অতএব চূড়ামণি মহাশয়কে, "স্নাব্" করিবার এরূপ প্রয়াস আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে। †

আমাদের এই ধারণার সমর্থনার্থ, এ স্থলে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে এই 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় ব্যাপার কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে :— "এ বৎসর (১৮৮৫ খৃ.) †† রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজীর (অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের) কথা শুনিয়া এবং তাঁহারা বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর কলিকাতাগমন সংবাদ স্বামীজী প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্ম্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত স্বামীজীর পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবনে স্বামীজীর গতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজী আধ্যাত্মিক ধর্ম্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ার তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামীজীর ঐ গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, এইরূপে স্বামীজীর পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত দর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজীকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে

---

* এই দলে শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণভক্ত দুই একজন যে না আছেন, একথা আমি বলিতেছি না—অবশ্যই আছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা এমনই "মোহগর্ত্তে নিপতিত" হইয়া আছেন যে, এই সম্প্রদায়ের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কীদৃশ অপকার হইতেছে, তলাইয়া দেখিতেছেন না।

† রামকৃষ্ণকে (এবং সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে) বাড়াইবার জন্য অপর লোকদের খাটো করিবার প্রয়াস "কথামৃত" "লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতিতে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

†† এতেও গোল আছে; "কথামৃত"কারের মতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে।
"কতকগুলি" ভট্টাচার্য্য!!

"চাপরাশ" বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যেরই ফলেই পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচার কার্য্য ছাড়িয়া কামাখ্যা পীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।" "লীলাপ্রসঙ্গ" গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ২২৩-২৪ পৃষ্ঠা।

'লীলাপ্রসঙ্গ'কার কিরূপে অবগত হইলেন যে, পণ্ডিতজী বক্তৃতা ছাড়িয়া কামাখ্যায় তপস্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন? চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মবক্তৃতা প্রসঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং কামাখ্যা দর্শনাদি করিয়া যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অব্দে শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফলতঃ এ সকল লেখক যে কত অসত্য এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের সম্মান যথেষ্ট করিতেন। চূড়ামণি মহাশয়কে অপ্রতিভ করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই 'লীলাপ্রসঙ্গ'কারের লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি—ঠাকুর। "ওগো পণ্ডিত তোমায় দেখলুম। অর্থাৎ সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে কিরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সকল আছে, তাহা দেখিলাম—(প্রসঙ্গকারের ফুটনোট)। তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে, গামছা-খানা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে কাপড় কাচ্‌তে যায়, আর হেঁসেল্ ঘরে ফিরে না—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বোলে কোয়ে যে যাবে আর ফির্‌বে না।" ঐ, গুরুতত্ত্ব উত্তরার্দ্ধ, পৃ. ২৩৯।

'কথামৃত'কারও লিখিয়াছেন, যখন বলরাম বাবুর বাড়ী চূড়ামণি মহাশয়, (প্রথম সাক্ষাৎকারের সপ্তাহ মাত্র পরে) রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যান, তখন তাঁহাকে—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) বলিতেছেন—আমরা সকলে বাসর শয্যায় জেগে আছি—কখন বর আসবে।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১২৬ পৃ.)

আবার আছে—

"পণ্ডিত বিদায় লইলেন। ঠাকুর বল্লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়ে দাও।

পণ্ডিত। আজ্ঞে না, আমরা অম্‌নি চলে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তা কি হয়—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—" ('কথামৃত', ঐ, ১৩০ পৃ.)

প্রতিবাদী কেহ কেহ, চুড়মণি মহাশয়ের উপর একটি অভিযোগ এই বলিয়া করেন যে, এই দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পরে কেন তিনি 'চাপরাশে'র কথার প্রতিবাদ করিতেছেন।—অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে তিনি কেন প্রতিবাদ করেন নাই। এবিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় বক্তব্য জানাইতে লিখি নাই—লেখা বাহুল্য মনে করিয়াছি। মদীয় পূর্ব্ব প্রবন্ধের সূচনায়ই লেখা আছে যে, তিনি (তিন বৎসর পূর্বে) গৌহাটি আসিলে, আমি তাঁহাকে পরমহংসদেবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি—'চারপাশ' সম্বন্ধেও তখনই কথা হয়, পরে আমিই নির্ব্বন্ধসহকারে চিঠি দিয়া তাঁহার লিখিত মন্তব্য (আমার পত্রের উত্তরচ্ছলে) আনাইয়াছিলাম। চূড়ামণি মহাশয়ের উপরে বহুবিধ অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কিছুর—প্রতিবাদ করিয়াছেন, বলিয়া আমি অবগত নাই। এমন কি, আজ ৩/৪ বৎসর হইল ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা" পত্রে * দুইবার "শশধর তর্কচূড়ামণি" বলিয়া তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রতিবাদে, উত্তরেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (তৎসহ প্রকাশিত) পত্রগুলি লেখেন নাই—আমিই বারংবার চিঠি ও তাগিদ দিয়া এগুলি লেখাইয়াছি।

উপসংহারে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের কথায় কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন—('সাহিত্য', আষাঢ়, ১৩২৮ বৈঠকী দ্রষ্টব্য) "তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সদ্ব্যাখ্যাতা, পরন্তু তিনি গৃহী। তিনি গহনে দুর্গম বনে ঘুরিয়া কখনই সাধু সন্দর্শন করিবার তেমন অবসর পান নাই" ইত্যাদি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নাই। গৌহাটিতে যখন তিনি শেষবার আইসেন, তখনই—এবং তাহাও কয়েক মুহূর্ত্তের মাত্র। তৎকালে আলাপ প্রসঙ্গে, শ্রীহট্ট জেলায় জয়ন্তীয়া স্থিত রামজঙ্ঘ মহাপীঠে গিয়া

---

* ১৩২৬ সাল—৪১ পৃ. ও ১০০ পৃ. দ্রষ্টব্য।

জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐস্থান তখন (১২৯৫) দুর্গম ও শ্বাপদাকীর্ণ ছিল এবং তিনি যে জীবনে তাদৃশ অনেক বড়লোকের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছেন।* ফলতঃ গৃহী হইলেও যাঁহারা তীর্থসেবী, তাঁহাদের সাধুদর্শনের সুবিধা বহুশই ঘটিয়া থাকে।

এ সকল প্রতিবাদের উত্তরচ্ছলে আমার নিজের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইবে।

উৎস : *সাহিত্য*, মাঘ, ১৩২৮

* শ্রীজয়ন্তী মহাপীঠ এবং উক্ত সাধু (ব্রহ্মচারী রাজপ্রসাদ) সম্বন্ধে সত্বরই একটি প্রবন্ধ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইবে—তাহাতে শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ঐ সাধু দর্শন বিবরণ একখানি চিঠিও প্রকাশিত হইবে।

সংযোজন-৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

একজন ভদ্রলোক, নাম শ্রীগোপালচন্দ্র রায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছেন। আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তিনি কোন স্তরের লেখক বা ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তাও আমি জানি না। কোন জীবনচরিত লিখতে গেলে নিজের একটি বিশিষ্ট ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্যই গ্রন্থ রচিত হলে সেটা ঠিক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক-মনের পরিচয় দেয় না। কেননা বিজ্ঞান ও ইতিহাস পুরুষতান্ত্রিক নয়, এগুলি বস্তুতান্ত্রিক। সুতরাং অত্যন্ত নিরপেক্ষ না হলে কোন উত্তম জীবনী লেখা সম্ভবপর নয়। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থটি কতদূর নিরপেক্ষভাবে জীবনী লেখা হয়েছে তা আমি বলতে পারছি না। কেননা তাঁর সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করার মতো সময় আমার নেই। কেবল একজন ব্যক্তি 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সেই অধ্যায়টি আমি পাঠ করেছি। পাঠ করে এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই লেখা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবমূল্যায়নের জন্য লিখিত। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এমন একজন ব্যক্তি নন যাঁর অভিমতকে কোন গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পরের যুগেও বিরাট মনীষী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউই জীবনের গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনীয় নন। সাধারণ মানুষের—তিনি সাহিত্যিক হন বা রাজনীতিবিদ হন বা সমাজসংস্কার হন, এমন কি দার্শনিক হন—তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের তুলনা হতে পারে না। কেননা তাঁদের প্রভাব তাঁদের জীবৎকালে এবং তার পরেও কিছুদিন হয়তো দু-এক শতাব্দী

প্রসারতা লাভ করে ধীরে ধীরে তা নামেমাত্র বর্তমান থাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তির প্রভাব উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মতো প্রবহমান থেকে সমগ্র মানব জাতিকে তার পরিমণ্ডলের ভিতরে নিয়ে আসে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের দেড়শত বর্ষ পূর্তির পর আমরা দেখছি যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে কী বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা জাতির জীবনে দেড়শ বছর কিছুই না। এটা জগতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রথম চরণপাত মাত্র। পূর্বগগনের সূর্যোদয়ের প্রথম অরুণিমা। তাঁদের জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়মাত্র মানুষের সম্মুখে অপাবৃত। এর পূর্ণরূপ কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করবে তা এখনই মানুষের সীমিত দৃষ্টির মধ্যে আনা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্বে আমি সোভিয়েত রাশিয়ার 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে প্রবেশ করেছিলাম। কেউ প্রচার করেনি—প্রচার করা বা কোন ভাবের অনুপ্রবেশ সেখানে অসাধ্য ছিল। তবুও দেখা গেছে সেখানকার বিদ্বজ্জন মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ কিভাবে যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখমালা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। মস্কো পরিত্যাগের প্রাক্-মুহূর্তে একজন বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রো-বায়োলজিস্ট আমার সঙ্গে দেখা করে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আলাপ করছিলেন। তারপর আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি তাঁর পকেট থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অ্যালবাম দেখালেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষ এখন বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছে। কম্যুনিস্টদের স্বর্গ রাশিয়াতেও এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের যারা কম্যুনিস্টদের অনুসরণকারী তাঁরা এখনও তাঁদের স্ট্যালিনের যুগে বা ব্রেজনেভের যুগে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু রুশদেশে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এটা আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্কিম বা অন্য কোন লেখক বা তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যাতা বা ধর্মমতের প্রচারক, তাঁদের সঙ্গে সমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং শিক্ষার বিস্তৃতি বুদ্ধের জীবন এবং তাঁর

ভাবধারার বিস্তৃতির সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর মতে এই আণবিক যুগে অশোক এবং গান্ধী প্রচারিত অহিংসার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সর্বধর্ম সমন্বয় কেবলমাত্র জগৎকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে। এই রাজ্যে বঙ্কিম নেই, কেশবচন্দ্র নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই; সারা পৃথিবীতে আর কোন মানুষ নেই যাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা চলে। সুতরাং শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা লিখিত হয়েছে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলে আমি 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি।

এই প্রাক্কথনের পরে শ্রীযুক্ত রায়ের যে গবেষণা তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রয়োজনও আছে। কেননা এই পণ্ডিতম্মন্য এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির লিখিত অনেক পুস্তক আছে। শুনেছি লেখক বলে কিছু খ্যাতিও আছে। সুতরাং তাঁর লেখা যেহেতু ছাপা অক্ষরে বেরিয়েছে, অনেকের কাছে তা অবধারিত সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং দেখা দরকার যে তাঁর লেখা সত্য বলে গ্রহণীয় কিনা।

প্রথমেই তিনি বলেছেন, ''বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে আসছে।" এই বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের মধ্যে কথোপকথন নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, ''আজ পর্যন্ত কেউই এই কাহিনীর উৎস অনুসন্ধান তো করেনইনি, এমন কি এর সত্যাসত্য নিয়েও যাচাই করেননি। এই কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ বলা তো দূরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোনদিন দেখাই হয়েছিল কিনা সন্দেহ।"

কেউ যদি বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত এবং বহুব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত একটি ঘটনাকে নিজের পূর্ব-নির্ধারিত কোন দৃঢ় ধারণা নিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করেন তবে সেটা মুক্ত মনের পরিচায়ক নয়। বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতির নিয়ম হচ্ছে suspended judgement অর্থাৎ স্থগিত সিদ্ধান্ত বা রায়। কিন্তু যিনি দৃঢ় ধারণা নিয়ে একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন সেটা বিচার হয় না, বিচারের প্রহসন হয় মাত্র। একটি গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন ব্যক্তি 'যুক্তিসঙ্গত' 'যুক্তিসঙ্গত' বলে খুব চিৎকার করছিল। অপরপক্ষ বলল যে, যুক্তিসঙ্গত কথার অর্থ কি? তৃতীয় ব্যক্তি বললেন যে, যুক্তিসঙ্গত মানে মনের মতো। শ্রীযুক্ত রায়ও এইরকম যুক্তিসঙ্গত কথাই বলে গেছেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যত বড় সাহিত্যিকই হন না কেন এবং তিনি ধর্ম নিয়ে যত আলোচনা করে থাকুন না কেন তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষানবীশ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তিনি বিচারের দিক দিয়ে ধর্ম আলোচনা করেছেন। তাও কোঁত, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক যাঁরা ধর্মের সঙ্গে সাধনার যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁদের অনুসরণ করে 'অনুশীলনতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে সাধনা প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না।

রামচন্দ্র দত্ত, স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয়কুমার সেন এবং শ্রীম বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হওয়ার কথা লিখে গিয়েছেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই অপরের কাছ থেকে ঘটনা সংগ্রহ করেছেন, বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লিখেছিলেন এবং বাল্যকাল থেকে তাঁর শেষদিন পর্যন্ত ঘটনাবলী তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কাজেই তিনি সব জিনিসই নিজের দৃষ্ট ঘটনার উপরে নির্ভর করে লেখেননি। বহু তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল নানা জনের কাছ থেকে। সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল এবং লিখিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বহুদিন পরে। সুতরাং যে তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন সে-তথ্য যে সর্বদা একেবারে অভ্রান্ত তা নাও হতে পারে। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ এমন একজন ব্যক্তি যিনি নানা গবেষণা করে তবেই লিখেছেন। বঙ্কিম বা শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে যাঁদের কথা অবান্তরভাবে শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়ে এসেছেন, স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখাটা প্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্যই স্বামী সারদানন্দ

সংক্ষেপে এঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যখন তিনি লিখেছিলেন তখনও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' যে-ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ রয়েছে তা প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিম সম্বন্ধে 'কথামৃতে'র ৫ম ভাগ ১৩৩৯ সালে অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের দেহান্ত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত শ্রী'র বর্ণিত বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথোপকথন সেটি দেখেননি। তিনি উপস্থিত যদি বা থেকে থাকেন তবুও তাঁকে বহুদিন পরে স্মৃতিনির্ভর হয়েই সংক্ষেপে ঐ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র দত্ত যে বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন এটা পাচ্ছি না। সুতরাং একজন বিখ্যাত ব্যক্তির (বঙ্কিমচন্দ্রের) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সেটির বিশদ বিবরণ রামচন্দ্রের কাছে আশা করা যায় না। এবং যেহেতু তিনি সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না সেই হেতু তাঁর লেখা সেটিকে শ্রীম-কথিত তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ বলে মনে করা যেতে পারে। যেটিকে শ্রীম-বর্ণিত "hearsay and unrecorded at the time of the Master" বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন জনসাধারণের জন্য পুঁথি রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং ভাবকে পৌঁছে দেওয়ার যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। কাজেই কিছু কিছু ভুল তাঁর গ্রন্থে থাকা সম্ভব, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন এবং তিনি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম'র বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। শ্রীগোপালচন্দ্র অক্ষয়কুমার সেন সম্বন্ধে মনের ময়লাধারী বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার সেনও শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সর্বজনবিদিত। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে ভাবাবেশে অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আদর করে 'শাঁখচুন্নি মাষ্টার' এই অভিধায় অভিহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ নাম অনেককেই দিতেন। যেমন তিনি স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে 'কেলুয়া' এবং 'ভুলুয়া' বলতেন। যখন জাপানী বিদগ্ধব্যক্তি

ওকাকুরা তাঁকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদেশে আসেন তখন তাঁকে তিনি 'অক্রূর খুড়ো' বলতেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি জানি না শ্রীযুক্ত রায়ের অবচেতন থেকে চেতন মন পর্যন্ত ধোপাবাড়ির কাচা কাপড়ের মতো ময়লাহীন এবং শুভ্র কিনা। যাঁরা মন বিশ্লেষণ করেন এরূপ কারুর কাছে গিয়ে তিনি যদি তাঁর মনের বিশ্লেষণ (psycho-analysis) করেন তখন বোঝা যাবে তাঁর মন ময়লাবিহীন কিনা। তবে আমাদের সমাজে বাইরের ভদ্র আচরণটুকুই ময়লাবিহীন রাখতে পারলেই তিনি শুদ্ধ এবং পবিত্ররূপে পরিগণিত হন। কিন্তু গোপালচন্দ্র রায় প্রচারিত যে-বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পানদোষ ছিল, চরিত্রগত অন্য দু-একটি দোষও তখনকার মানুষের জল্পনা এবং আলোচনার বিষয় হয়েছিল, একথা মণি বাগচী লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না।

এর পরে লেখক কেন রামকৃষ্ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়নি, তার সংখ্যাগত একটি দীর্ঘ পর্যালোচনার অবতারণা করেছেন। এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে এই লেখকের ইতিহাসজ্ঞান এবং দৃষ্টি নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা—শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেশে ফিরলে হাওড়া স্টেশনে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমুৎসুক হয়েছিলেন। অথচ এ ব্যাপারে রামকৃষ্ণের প্রধান-শিষ্য বিবেকানন্দকে অভিনন্দন তো নয়ই, এমন কি তাঁর সম্বন্ধে তিনি একটা কথা কোথাও বলেননি। এ থেকেও বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আকর্ষণই ছিল না।" কী অপূর্ব ইতিহাসজ্ঞান এবং অপূর্ব যৌক্তিকতা! প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতার পরে যা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়, যখন দেশে এসেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘকাল রোগভোগের পরে। তিনি বিবেকানন্দকে জানতেন কিনা এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন কিনা কোথাও উল্লিখিত নেই। স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফেরেন

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, তার তিন বছর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকে। বিদ্যা-ধুরন্ধর গোপালচন্দ্র কি মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক থেকে এসে হাওড়া স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন এবং সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত হয়ে তাঁর সমুৎসুকতা প্রদর্শন করবেন?

লেখক ভূধর চট্টোপাধ্যায়কে 'শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক ভক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। ভূধর চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন না। তাঁর দাদা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজে শশধর তর্কচূড়ামণিরই ভক্ত ছিলেন।

শশধর তর্কচূড়ামণির কথা লেখক তাঁর প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে উঠিয়েছেন। সুতরাং তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

''কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে-ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

''আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজে পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।''

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউই শশধর তর্কচূড়ামণিকে বিশেষ কোন পাত্তা দেননি।

তর্কচূড়ামণির ব্যাপারে আর একজনের লেখাও উদ্ধৃত করা যায় যদিও তিনি তর্কচূড়ামণিকে ব্যঙ্গ করেছেন কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ভাববার কথা' গ্রন্থে একটা ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখেছেন। সেটার সংক্ষেপিত রূপ হচ্ছে এই : লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারী ধুম! লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে। এই উপলক্ষে দর্শকবৃন্দের মধ্যে দুজন ভদ্র রাজপুত ঠাকুর সাহেব ধুম দেখতে লক্ষ্ণৌ এসেছেন। সবাই ইমামাবাড়ার দিকে যাচ্ছে দেখে তাঁরাও সেদিকে গেলেন। ইমামবাড়ায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন একজন সিপাহীর কাছে। সে বলল যে, দ্বারপাশে যে মুরদ খাড়া রয়েছে ওকে আগে পাঁচ জুতা মারলে তবে ইমামবাড়ার ভেতরে যাওয়া যাবে। সে মূর্তি কার? সিপাহী বললেন ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মূর্তি। সে হাজার বছর আগে হাসেন-হোসেনকে মেরেছিল, যার জন্য এদিনের ক্রন্দন ও শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু রাজপুত ঠাকুররা জুতো মারা তো দূরের কথা গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্বিদের মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি ও গদগদস্বরে স্তুতি আরম্ভ করল এবং বলল যে—ভেতরে আর কি ঠাকুর দেখব? ভল্ বাবা অজিদ, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত। অর্থাৎ ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ, এমনি মেরেছো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!! এই গল্পটি লিখে স্বামীজী আরও কয়েকটা গল্প এর সঙ্গে যোগ করেন তার মধ্যে একটা এই : "গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য— মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত

বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি। তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু। উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর! ভল্ বাবা 'অভ্যাস' 'অস্মারো' ইত্যাদি।"

উপরে লিখিত রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকেই বোঝা যায় যে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম প্রচারের যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা হিন্দু ধর্মের উন্নতি না করে মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই আজ তাঁর নাম এবং তাঁর উপদেশ খুব কম লোকেরই জানা আছে। শশধর তর্কচূড়ামণির নাম এখন অধিকাংশ বাঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ও অবলুপ্ত।

লেখকের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁত, বেন্থাম প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুধর্মের আলোচনামাত্র করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের যে প্রধান অবলম্বন সাধনার দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার তা তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা ছিল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধিক ভূমিতে ধর্মব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র, যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে। তিনি কোন কিছুই গ্রহণ

করেননি যতদিন সেটি তাঁর জীবনে প্রমাণীকৃত (verified) না হয়েছে। মূর্তিপূজা থেকে অদ্বৈতব্রহ্মের উপলব্ধি পর্যন্ত সবই তিনি তাঁর জীবনে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমত তা হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত হোক বা বহিরাগতই হোক সবগুলিরই সাধনা করে তাদের সত্যতা নির্ণয় করেছিলেন। জগতের ধর্মের ইতিহাসে, আর্নল্ড টয়েনবীর মতে, এটি একটি অদ্বিতীয় এবং অনুপম ('unique') ব্যাপার। সুতরাং লেখক—যিনি ধর্ম সম্বন্ধে কোন সাধনা ইত্যাদি করেছেন বলে মনে হয় না—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মসাধনার সমালোচনা করতে গিয়ে নিজের প্রাজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন। এখানে ঔপনিষদিক অর্থে 'প্রাজ্ঞ' শব্দ ব্যবহার করছি—যিনি প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। তাঁর পক্ষে স্ত্রীজাতির গোপনীয় অঙ্গ অশ্লীল ভাবের উদয় ঘটায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনে তা জগৎ যোনি ও মাতৃভাবেরই উদয় করত। শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সাধনার সময়ে লিঙ্গপূজা, রাধাযন্ত্র নিয়ে সাধনা প্রভৃতি যা বলেছেন তা লেখকের পক্ষে বোঝা সাধ্যাতীত। সুতরাং 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং' তাঁর না করলেই ভাল ছিল। এবিষয়ে যদি উনি সংস্কৃত জানেন—তাঁকে 'হিতোপদেশ' পাঠ করতে বলছি।

লেখক স্বামী সারদানন্দের পুস্তক এবং অক্ষয়কুমার সেনের পুস্তক সম্বন্ধে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে এঁদের পুস্তক সামগ্রিক জীবনের ঘটনাবলী দিয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত। তাই বহুলোকের কাছে বহু ঘটনা শুনে সেগুলির উপর নির্ভর করে তাঁদের পুস্তক লিখতে হয়েছিল। সুতরাং যেগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনা নয় তাতে কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকতে পারে। প্রত্যেক জীবনীতেই এটা হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে বাল্যকালের ঘটনা এবং যে-সমস্ত ঘটনা লেখকের স্বয়ং না-দেখা সেগুলি সম্পর্কে অপরের কাছে শ্রুত বিষয় না নিয়ে উপায় থাকে না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমরা শ্রীম'র তথ্যই গ্রহণ করব। কেননা তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।" এ-বিষয়ে শ্রীম আরও যা লিখেছেন সেটি দিয়ে দেওয়া

প্রয়োজন : ‘‘তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর অর্থাৎ শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে।’’ এ-বিষয়ে লেখকের বক্তব্য : ‘‘রামকৃষ্ণের এক-এক সময়ের দীর্ঘ আলোচনা বা কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে না লিখে পরে লিখলে, তাতে যে শ্রীম'র নিজের অনেক কথাই ঢুকবে, তা বলাই বাহুল্য। কেননা শ্রীম এমন শ্রুতিধর ছিলেন না যে, পরে ঐ অত কথা লিখবার সময় স্মৃতি থেকে হুবহু সেই কথাগুলোই লিখেছিলেন।’’ লেখক কেমন করে জানলেন যে শ্রীম শ্রুতিধর ছিলেন না? যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে তিনি শ্রুতিধরই ছিলেন এবং স্মৃতিধরও ছিলেন। সুতরাং শ্রীম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় লেখকের কথা অর্বাচীনতার এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। তিনি লিখেছেন রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গের সময় শ্রীম ‘‘উপস্থিত ছিলেনই না’’ এবং ‘‘ডায়েরি থেকেও নেওয়া নয়’’। এটি লেখকের কোন্ অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত? শ্রীম যেখানে উপস্থিত ছিলেন না সেটি তাঁর সূত্রানুযায়ী তিনি ‘কথামৃতে’ লিপিবদ্ধ করেননি। সুতরাং তিনি সেদিন উপস্থিতই ছিলেন। বরিশালের বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : ‘‘যাক্ তুমি অনেক দিন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম'র মতো কপাল করে আসিনি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ মুহূর্ত আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো।’’ এতেই বোঝা যায় দেশবিখ্যাত অশ্বিনীকুমারও জানতেন যে শ্রীম কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখেছিলেন এবং পরিবেশন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন : "The Socratic dialogues are Plato all over, you are entirely hidden." অর্থাৎ সক্রেটিসের যে কথোপকথন সেটা প্লেটোর মতামতেই পূর্ণ। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ নিজেকে গোপন রেখেছ। কাজেই শ্রীম নিজের উল্লেখ ‘কথামৃত'তে খুব কমই করেছেন, করলেও প্রথম দিকে দর্শনের সময় কিছুটা আছে। আর যখনই নিজের ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তখন অন্য নামে সেই ভাব দিয়েছেন।

তাছাড়া মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি বলেছিলেন সেটা জেনে নিতেন এবং দেখতেন তিনি ঠিক সব কথা ধরতে পেরেছেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যুবক শিষ্য (পরে সন্ন্যাসী) কাগজ পেন্সিল নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখে রাখছিলেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, ওকাজ তাদের নয়, ওকাজ মাষ্টারের। লেখক শ্রীম সব ঘটনা পরপর না লেখায় অস্বাভাবিকতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীম কি কারও আদেশমাফিক গ্রন্থ লিখেছেন? তাঁর কাছে যখন যেটি প্রকাশযোগ্য এবং লোকের পক্ষে কল্যাণকর মনে হয়েছে সেটা তিনি তাঁর 'কথামৃত' প্রকাশের সুদীর্ঘকালে (১৯০১ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) নানা সময়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। এর ভেতরে পারম্পর্য রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। লেখকের নিজের কি কোন স্বাধীনতা থাকবে না? গোপালচন্দ্রের বই-এর ভেতরে তিনি লিখেছেন, "বিক্রি দেখে বই-এর সংখ্যা বাড়াবার" বা "এতেই তো মনে হতে পারে, পরে তিনি তাঁর গ্রন্থের অপর ভাগটি রচনা করবার জন্যই আগের দিনের লেখার জের টেনে বাড়িয়ে এই ভাগ রচনা করেছেন। এবং এরূপ সন্দেহ বা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।" অপূর্ব যুক্তি! সন্দেহ উঠতে পারে সেই মন সম্পর্কেই যে-মন একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে কোন একটা জিনিস প্রমাণ করতে চায়। আর অনুমান করা কাকে বলে লেখক কি সেটা জানেন? অনুমান করার কতকগুলি নিয়ম ন্যায়শাস্ত্রে আছে। ইংরেজি ন্যায়শাস্ত্রের (logic-এর) ভিতরেও আছে। অনুমান করতে গেলে আমাদের তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে পাঁচটি অবয়ব-বাক্য প্রয়োজন আছে। সেগুলো হল—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন এবং নিগমন। এগুলো না থাকলে ঠিক অনুমান হয় না। সুতরাং লেখককে অনুরোধ, অনুমান প্রভৃতি করার আগে নিজে একটু ন্যায়শাস্ত্র পাঠাদি করে তারপর অনুমান করতে যাবেন। 'অনুমান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে তিনি হাস্যাস্পদই করে তুলেছেন।

লেখক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার কখনই হয়নি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করেছেন। সবগুলোর এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবুও

কয়েকটা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন হয়েছিল এবং সে দর্শনে শ্রীম উপস্থিত ছিলেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে এই যে, শ্রীম নিজে বলেছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপরেই নির্ভর করেছেন, শোনা কথার ওপরে নয়। যাঁরা শ্রীম-কে জানেন এবং দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে তিনি কতটা সত্যাশ্রয়ী ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন এবং গৃহস্থ হয়েও সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত ছিলেন। এগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের কথা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়নি বলেই যে সে সাক্ষাৎকার হয়নি একথা এক নির্বোধ ছাড়া কেউ বলবে না। আচার্য ব্রজেন শীল প্রভৃতি অনেকে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথাও কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লেখক কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের যে অনুভব সেটারই উল্লেখ করেছেন। সেটা পড়লে এই কথাই মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র যেন সুকুমার রায়ের লেখা—"হুঁকো মুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নানা জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি কেমনসব রকম মানুষের সঙ্গেই সহজভাবে মিশতেন এবং দীনবন্ধু প্রভৃতি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা, একই ঘরে বসবাস তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের যে বর্ণনা "কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না।"—এটা মাত্র আংশিক উপলব্ধি।

গ্রন্থকার শ্লীল, অশ্লীল ব্যাপার নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছেন। অশ্লীলতা কেবলমাত্র মুখের কথার ভেতরেই থাকে, লেখার ভেতরে কি থাকতে পারে না? রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তার প্রতি অঙ্গ তরে", 'দেহের মিলন' কবিতায় লেখা আছে সমগ্র কবিতাটি অশ্লীল। 'বিবসনা' কবিতাটি—সেটিও ঠিক তাই। 'চুম্বন' কবিতাটিও ঠিক তাই। আরও অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অশ্লীলতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়াতীতকে ধরতে পারেননি, ইন্দ্রিয়গত জীবনকে নিয়েই ছিলেন। সুতরাং তাঁর ভেতরের যে ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রকাশ তাঁর কাব্যে থাকবেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের

তা নয়। তাঁর মন-মুখ এক ছিল, তাঁর গ্রাম্যভাষা ছিল এবং গ্রাম্যভাষার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের ভাব প্রচার করতেন। এমন একটি ঘটনার কথা অশ্বিনীকুমার দত্ত উল্লেখ করেছেন। কেশবের সামনে তিনি বলেছেন : "আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবো আর বাহ্যে যাব। আমি ওসব পারবোনি।" কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন, এক এক বার ভাবের ভারে 'আঃ আঃ' করছেন।" সুতরাং নিরক্ষর গ্রাম্য মন-মুখ এক একটি ব্যক্তি উচ্চতত্ত্ব যদি সভ্যসমাজের তথাকথিত অশ্লীল ভাষায় কথা বলে থাকেন এবং উচ্চতত্ত্বও প্রকাশ করে থাকেন, তাতে কি বোঝা যায় যে তাঁর ভেতরটা অশ্লীলভাবে পরিপূর্ণ?

গোপালচন্দ্র রায়ের আদর্শ পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র কি করেছেন তাঁর জীবনের যে অনুশীলনতত্ত্ব তাতে লেখা আছে। তিনি মানুষের সমস্ত বৃত্তিকেই অনুশীলন করতে বলেছেন পরিমার্জিতভাবে। এর ভেতরে কামেরও স্থান আছে। সুতরাং অশ্লীলতারও স্থান আছে। স্ত্রী-সম্ভাষণ প্রভৃতির ভেতরে তাঁর নিজের জীবনে এর প্রকাশ কি হয়নি? এমন কি তাঁর উপন্যাসের ভেতরে রোহিণীকে কিভাবে তিনি মগ্নাবস্থা থেকে উদ্ধার করে চেতনা ফিরিয়েছেন গোবিন্দলালকে দিয়ে। তার বর্ণনাও খুব শ্লীল নয়। দেবী চৌধুরাণীকে তিনি নিষ্কাম কর্মের আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার ভেতরে দিয়ে দেবী চৌধুরাণীর জীবনের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "যথাকালে পুত্র পৌত্র সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।" প্রফুল্লর যে পুত্রাদি হয়েছিল সেটা কি নিষ্কাম কর্মের দ্বারা? বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতা'র প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং 'গীতা'কে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ মনে করে তার একটি টীকাও লিখেছিলেন। কিন্তু এই 'গীতা'র ভেতরে চতুর্দশ অধ্যায়ে একটি শ্লোকার্ধ আছে, "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"। যোনি, গর্ভ এবং গর্ভাধান যে গ্রন্থের ভেতরে আছে সেই অশ্লীল কথায় পরিপূর্ণ গ্রন্থকে কি করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন?

পূর্বেই বলেছি যে, সাধারণ মানুষের ধর্ম আচারভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই ছিল। অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলে

তিনি কোথাও বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমের যে কথাবার্তা সেটা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম যা দিয়েছেন তাইই ঠিক। লেখকের আবোল-তাবোল কথা দিয়ে সেটা খণ্ডন করার চেষ্টা একটা হাস্যকর ব্যাপার। বঙ্কিম অধরের সঙ্গে এবং আরও কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঠাকুরকে তাঁরা কিভাবে দেখেন সেটা নির্ণয় করবার জন্যই এসেছিলেন। শ্রীম'র ভাষায়, ''তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিনা।'' শ্রীম বঙ্কিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, প্রথম যখন অধর তাঁকে 'বঙ্কিমবাবু' এই নামে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পরিচিত করান তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেছিলেন, ''তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'' বঙ্কিম তার উত্তরে বলেছিলেন, ''আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে বলেছিলেন, ''শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।'' এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ব্যাখ্যান করেছিলেন। তখন বঙ্কিম প্রভৃতি অভ্যাগতগণ ইংরেজীতে কথা বলছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী বুঝতেন না। কাজেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইংরেজীতে কি কথাবার্তা হচ্ছে? অধর বলেছিলেন যে তাঁরা কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে হাস্য-পরিহাস করে বলেছিলেন একটা নাপিতের গল্প। এক ভদ্রলোককে সেই নাপিত কামাচ্ছিল। ভদ্রলোকের একটু লাগায় সে বলেছিল 'ড্যাম'। তাতে নাপিত জিজ্ঞাসা করে 'ড্যামে'র অর্থ কি? ভদ্রলোক বলেন যে ও কিছু নয়, তুই সাবধানে কামা। নাপিত সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছিল, 'ড্যাম' মানে যদি ভাল হয় তাহলে তাদের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত সকলে ড্যাম আর যদি 'ড্যাম' মানে খারাপ হয় তাহলে ঐ ভদ্রলোকের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত সকলেই ড্যাম। এই গল্পটি সকলেই খুব উপভোগ করেছিলেন। তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারের জন্য বঙ্কিম বলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে চাপরাশ না পেলে কেউ প্রচার করতে পারে না। এ-বিষয়ে একটু রসিকতাও করেছিলেন। চাপরাশ অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেওয়া। আমরা জানি বঙ্কিম অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন, প্রচার

করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ''আদেশ হয়নি তুমি বকে যাচ্ছ; ঐ দুদিন লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে।'' বঙ্কিমও বহু প্রচার করেছিলেন তাঁর গ্রন্থের মধ্য দিয়ে—'ধর্মতত্ত্ব', 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ। কিন্তু আজ সে গ্রন্থগুলি বা কে পড়ে আর সে মতই বা কে গ্রহণ করে! কিন্তু অশ্লীলভাষী শ্রীরামকৃষ্ণের যে-প্রচার তার সম্বন্ধে শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীমকে লিখেছিলেন, ''ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা... ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃত কণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ'। আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন ভাগ্যধর!''

তারপরে নানা বিষয়ে আলোচনা হতে হতে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ''মানুষের কর্তব্য কি?'' বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন : ''আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।'' তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ছ্যাঁচড়া' বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যা রাতদিন তিনি করেন তাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। লোক যা খায় তার ঢেকুর ওঠে এবং মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। এ-সম্বন্ধে লেখকের অভিমত ''অতএব, মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে বঙ্কিমের মতো মানুষ কখনই আহার, নিদ্রা, মৈথুন বলতে পারেন না বা বলেনওনি।'' কেন পারেন না বা বলেননি এ-বিষয়ে যে-সমস্ত কথা লেখক তুলেছেন সেগুলো মোটেই ঠিক নয়। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি যে 'কথামৃত' শ্রীম'র প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি যা লিখেছেন সেটাই ঠিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ের লোক এবং তিনি যে-উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাকে মৈথুন শব্দের উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এবং তাঁর জীবনীতে রঙ্গরসিকতার অনেক কথা পাওয়া যায়। কাজেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষার জন্য মৈথুন শব্দ উচ্চারণ করে থাকেন যেটা সে যুগের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয় প্রাচীন শাস্ত্রেও রয়েছে, ''আহার

নিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুর্ভিনরাণাম্ ধর্মহি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।" সুতরাং যে-বঙ্কিমচন্দ্র 'বেদ' 'গীতা', 'স্মৃতি', 'পুরাণ' পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি 'বেদ' থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতেই মৈথুন প্রভৃতি কথা পাঠ করেছেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন আলোচনা করতেন বা কথাবার্তা বলতেন বিশেষতঃ সেই যুগে যখন মানুষের মুখ আলগা ছিল তখন এইসব কথা বলতেন না এটা কি করে বলা যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র কোন 'বস্ওয়েল' বা শ্রীম ছিল না। তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তা, বন্ধুদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস কি ধরনের হত তা কে বলবে? লেখক অবশ্য সর্বজ্ঞ, তিনি একেবারেই বলে দিয়েছেন, 'বলেনওনি।' কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতেই গিয়েছিলেন এবং সেই সময়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সংস্কৃত গ্রন্থ হতে পাওয়া, যার উদ্ধৃতি আমরা পূর্বে দিয়েছি। সেটাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে এক জায়গায় লিখেছেন, "কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর তো জিতেন্দ্রিয় কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মতো দেখিল বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আঃ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!" 'দেবী চৌধুরাণী'তেই 'প্রফুল্লকে চুম্বন করেছিলেন' এভাব আছে। লেখক রবীন্দ্রনাথের লিখিত কয়েকটি লাইন পড়েই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে-ধারণা করেছেন তাতে মনে হয় বঙ্কিম ভিক্টোরীয় যুগের একটি 'প্রুড' ছিলেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহ এবং তাঁর লেখা পাঠ করলে বঙ্কিম তা ছিলেন বলে মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ কিনা স্থির করবেন বলেই। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণকে 'আহার নিদ্রা মৈথুন' এই কথা উচ্চারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া দেখে জানবার ইচ্ছা

বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সেজন্য ঐরকম কথা ব্যবহার করে তিনি নিজেকেও হেয় করেননি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করেননি। তিনি পরীক্ষাই করেছিলেন। লেখক আরও নানারকম কথার অবতারণা করেছেন। সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যক্ষদর্শী, সত্যবাদী, মহা ধার্মিক পুরুষ শ্রীম যা লিখেছেন সেগুলিই ঠিক এবং সত্য। কিন্তু লেখকের তা বোঝবার মতো শক্তি নেই। বোধহয় শোপেনহাওয়ার একজায়গায় বলেছেন—"Books are like mirrors and if an ass looks into it you cannot expect an angel to look out." (বইগুলি হচ্ছে দর্পণের মতো, তার দিকে যদি একটা গাধা তাকায় তাহলে তুমি আশা করতে পার না যে দর্পণের ভেতর থেকে একজন দেবদূত বাইরের দিকে তাকাচ্ছে) : আর এক জায়গায় বলেছেন, "If a book and a head come into contact and one sounds hollow, is it always the book?" (যদি একটা বই-এর সঙ্গে এবং একটি মাথার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে এবং তার একটি শূন্যগর্ভ মনে হয়, তবে সেটা কি পুস্তকই?) সুতরাং "পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—এই বলেই আমার প্রবন্ধ সমাপ্ত করতে হচ্ছে।

উৎস : *উদ্বোধন*, কার্তিক, ১৩৯৪।

লেখক-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ : সন্ধান-সদৃশে

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর (১০ অগাস্ট, ১৮৫৭-১০ অক্টোবর, ১৯৪৬) : হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার সন্নিকটস্থ ভদ্রকালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে পূর্ণচন্দ্রের জন্ম। ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ (অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আন্দুল, বরাহনগর, শিবপুর, কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯০২ সালে তিনি বারাণসী যান। সংস্কৃত 'উদ্ভট' শ্লোকের বিপুল সংগ্রহ ছিল তাঁর কাছে। যে কারণে বারাণসীস্থ জম্মু-কাশ্মীর রণবীর পাঠশালার অধ্যাপকেরা তাঁকে 'উদ্ভটসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও 'কাব্যরত্ন', 'কবিভূষণ' ইত্যাদি সম্মান-প্রাপ্তিও হয়েছিল তাঁর। যদিও 'উদ্ভটসাগর' উপাধিতেই তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তিনি বাগবাজারের প্রথম ইতিহাস রচনা থেকে শুরু করে কলকাতার ইতিহাসের নানা আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'উদ্ভট-শ্লোকমালা', 'উদ্ভট-সমুদ্র', 'স্তবসমুদ্র' ইত্যাদি সংস্কৃত স্তোত্র-শ্লোক গ্রন্থের প্রণেতাও তিনি। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও কাশীদাসী 'মহাভারত' সম্পাদনার পাশাপাশি 'কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি', 'ভোলা ময়রা', 'অ্যান্টনি কবিয়ালে'র মতো একালের বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি-র প্রথম প্রামাণ্য জীবনী-রও লেখক পূর্ণচন্দ্র। শেষজীবনে আশুতোষ কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক হওয়া এই মানুষটির অধিকাংশ রচনা-ই সাময়িক পত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রয়েছে।

কৃষ্ণকুমার মিত্র (ডিসেম্বর, ১৮৫২-৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৬) : বিখ্যাত বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমী ও ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বাঘিল গ্রামে। আপাদমস্তক জাতীয়তাবাদী পরিমণ্ডল

তিনি পেয়েছিলেন। বাবা ছিলেন গুরুপ্রসাদ মিত্র যিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের গ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে শ্বশুর হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের পিতামহ রাজনারায়ণ বসুকে। তাঁর শ্যালিকা-পুত্র ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। এই ঘরানাতেই ১৮৮৩ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর সুকুল ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সহযোগিতায় *সঞ্জীবনী* নামক জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিকীটি প্রকাশ করেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে পত্রিকাটির সমুজ্জ্বল ভূমিকা আজ অবশ্যস্বীকার্য। একই সঙ্গে আসামের চা-বাগানের কুলিদের ওপর ব্রিটিশ শাসক ও মালিদের বর্বরোচিত অত্যাচারের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও *সঞ্জীবনী* অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়। কৃষ্ণকুমার স্বয়ং 'কুলীর রক্ত' জ্ঞানে চা-পান পরিত্যাগ করেন। সিটি কলেজের সর্বজনশ্রদ্ধেয় পরম দেশানুরাগী এই মানুষটি 'মহম্মদ-চরিত', 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১ জানুয়ারি, ১৮৪৭ - ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) : সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ ভট্টাচার্য ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পান। প্রথম জীবনে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী, পরে কোচবিহার বিবাহ-কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় ভাঙন দেখা দিলে তিনি কেশবসঙ্গ ত্যাগ করলেও তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক আজীবন বজায় রেখেছিলেন। কেশবের মতোই রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন তিনি। পরে থিয়েটারের লোকজনদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতায় শিবনাথ তাঁর দূরবর্তী হয়ে গেলেও রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর সমুচ্চ শ্রদ্ধা আজীবন বজায় ছিল। উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিবনাথ রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', 'History of the Brahmo Samaj' Vol.-I & II, 'আত্মচরিত' প্রভৃতি সমকালীন ইতিহাসের একটি আকর দলিল। মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের *সোমপ্রকাশ* এবং ছোটোদের *মুকুল* পত্রিকারও কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন তিনি। বহু কবিতা, ছোটোগল্প ও উপন্যাসেরও রচয়িতা তিনি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৯ মে, ১৮৬৫ - ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) : শিবনাথ শাস্ত্রী ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের এই সুযোগ্য ছাত্রটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর বাংলা মাসিক *প্রবাসী* ও ছত্রিশ বছর ইংরেজি মাসিক *মডার্ন রিভিউ* সম্পাদনার জন্য। স্কুলজীবনে আদর্শবাদী ব্রাহ্ম-শিক্ষক কেদারনাথ কুলভী-র কাছে একদিকে যেমন রামমোহন রায়ের মতো ব্রাহ্ম-মনীষীদের সম্পর্কে সুপরিচিত হয়েছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কেও অবগত হয়েছিলেন তাঁর কাছেই। তৎ-সম্পাদিত *ধর্মবন্ধু*-তে (আশ্বিন, ১২৯৭ ব.) রামকৃষ্ণদেবের উক্তিগুলিকে সন্নিবেশিত করেছিলেন তিনি। তাঁর *প্রদীপ* ও *প্রবাসী*-তেও 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল (যথাক্রমে শ্রাবণ, ১৩০৬ ও আষাঢ় ১৩১১)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আজীবন সদস্য, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল কান্ডারি, মদনমোহন মালব্যের মতোই একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে হিন্দু-মহাসভা—দুই রাজনৈতিক দলেরই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার-প্রাপ্ত এই অসামান্য মানুষটি দেশীয় সংবাদপত্র পরিচালনায় অবিসংবাদিত নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যা আজ সর্বজনস্বীকৃত। সেই সঙ্গে অন্ধ মূকবধির মানুষের সেবা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও তাঁর কর্মপ্রয়াস অবশ্য উল্লেখনীয়। বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু কোনোদিন তাঁকে স্বীয় আদর্শ ও কর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রবাদপ্রতিমতাকেও অতিক্রম করেছে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১ - ২৭ অক্টোবর, ১৯০৭) : হুগলি জেলার খন্যান গ্রামের সুবিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম। প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তরকালের বিবেকানন্দকে। ধর্মীয় অস্থিরতা তাঁকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সিন্ধুদেশে গিয়ে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক পাদরি ও পিতৃব্য কালীচরণের প্রভাবে ১৮৯১ সালের গোড়ায় প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট, পরে ওই বছরই ক্যাথলিক

খ্রিস্ট ধর্মমতে দীক্ষিত হন। পরে মূলত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবেই আবার সনাতন ধর্মে আশ্রয় নেন। তবে ধর্মজীবনে এহেন সংকটের মাঝেও তাঁর স্বদেশ-আনুগত্যে কোনো চিড় ধরেনি। তিনি *কংকর্ড*, *হার্মান*, *ফিনিক্স* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করলেও শেষজীবনে *সন্ধ্যা* ও *স্বরাজ* পত্রিকা সম্পাদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যান। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল : 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি', 'ব্রহ্মামৃত', 'সমাজতত্ত্ব', 'আমার ভারত উদ্ধার', 'পালপার্বণ' ইত্যাদি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (২০ ডিসেম্বর, ১৮৬৬ - ১৫ নভেম্বর, ১৯২৩) : আদি নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহর হলেও পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে জন্ম পাঁচকড়ির। পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮৭ সালে সংস্কৃত অনার্সে বি.এ. পাশ করার পর কাশীতে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান। সেখানে কালীপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণির মতো রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। কাশীতেই সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য বিষয়ে চর্চা করে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিও পান তিনি। কর্মজীবন শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরি ও অধ্যাপনা দিয়ে। পরে আসেন সাংবাদিকতা পেশায়। এখানে তাঁর সাফল্য অবিস্মরণীয়। *বঙ্গবাসী*, *সাপ্তাহিক বসুমতী*, *রঙ্গালয়*, *দৈনিক হিতবাদী*, *বাঙ্গালী*, *বঙ্গবাসী* গোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক *টেলিগ্রাফ*, কার্টুন প্রকাশের জন্য বিখ্যাত *নায়ক* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি *ভারত মিত্র* নামক হিন্দি পত্রিকার সম্পাদনা কর্মেও সুপটু ছিলেন পাঁচকড়ি। পাশাপাশি একগুচ্ছ বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি সাময়িকীর সঙ্গেও লেখক হিসেবে যোগ ছিল তাঁর। জীবন-সায়াহ্নে *প্রবাহিণী* নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রয়াণের পর *সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদনা-ভারও বর্তেছিল তাঁর কাঁধে। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, পাশাপাশি অনুবাদ ও সম্পাদনাও করেছেন।

নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৩ জানুয়ারি, ১৮৮৯ - ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪) : পিতা রজনীকান্তের কর্মক্ষেত্র রংপুরের নীলফমারী-তে বিদ্যালয়-শিক্ষা

সমাপ্ত করে ১৯০৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনেই জড়িয়ে পড়েন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হলেও প্রমাণাভাবে বছর খানেকের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যান। জেলেই ঋষি অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। মুক্তির পর তাঁর পরিচালিত *ধর্ম* ও *কর্মযোগিন* (ইং) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। আজীবন স্বদেশিয়ানায় বিশ্বাসী নলিনীকান্ত অরবিন্দের আহ্বানে পণ্ডিচেরি চলে যান। একদিকে গ্রিক, লাতিন ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা, অন্যদিকে সাহিত্যসৃষ্টি ও যোগসাধনার সূচনাও পণ্ডিচেরিতে হয় তাঁর। তাঁর অসংখ্য রচিত গ্রন্থের মধ্যে ৫২টি বাংলায়, ৩৮টি ইংরেজিতে ও ৫টি ফরাসি-তে। অরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যটির বঙ্গানুবাদ তাঁরই কৃত। তিনি ১৯২৬ সাল থেকে আজীবন পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বনফুল (১৯ জুলাই, ১৮৯৯ - ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) : প্রখ্যাত সাহিত্যিক বলাইচাঁদবাবুর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময়ই ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম কবিতা *মালঞ্চ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর *প্রবাসী* ও *ভারতী* পত্রিকায় তাঁর কবিতা 'বনফুল' ছদ্মনামে ছাপা হয়। পেশায় ডাক্তার বনফুলের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর', তাঁর শিক্ষক, ব্যঙ্গরচনার পথিকৃৎ মানুষ ডা. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে বিরচিত। পরবর্তীকালে যা চলচ্চিত্র হলে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন উত্তমকুমার। শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'পশ্চাৎপট', 'বিন্দুবিসর্গ' ইত্যাদি। রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক সহ সারা জীবন বহু সম্মান লাভ করেছেন। ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. পেয়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সভাপতিও ছিলেন।

রেজাউল করীম (১৯০২-১৯৯৩) : বীরভূম জেলার শাসপুর গ্রামে জন্মানো এই মানুষটি পেশায় অধ্যাপক। বহরমপুর কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বিভিন্ন সময়ে মাসিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও নিযুক্ত থেকেছেন। দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী রেজাউলের বিভিন্ন চিন্তাশীল প্রবন্ধ সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫) : নিজের সাংবাদিক সত্তাকে মর্যাদা দিতে নিজের সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি একপ্রকার অবিচার করা এই ব্যক্তির জন্ম ফরিদপুরে। রবীন্দ্রানুরাগী সন্তোষবাবুর ১৯৪০ সালে বি.এ. পাশ করার দু'বছরের মধ্যে *যুগান্তর* পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়। ১৯৫৮ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সাংবাদিকতায় যুগান্তকারী বিপ্লব আনেন। *আনন্দবাজারের* সংযুক্ত সম্পাদকও হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে। বহু সাংবাদিক গড়ার কারিগর এই মানুষটি 'নানা রঙের দিন', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে' প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি কিছুটা সুবিচার করেছিলেন।

নিশীথরঞ্জন রায় (১০ নভেম্বর, ১৯১০ - ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪) : ময়মনসিংহের মানুষ নিশীথবাবু কলকাতা-চর্চাকেই তাঁর আজীবন সাধনার পাথেয় করেছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনার সূত্রে কর্মজীবনের একটা বড়ো অংশ কেটেছে তাঁর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটার ও সেক্রেটারি হিসেবে ১০ বছরের মেয়াদে বহু অমূল্য শিল্পকর্ম ও পুথি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মোচন করে দেন তিনি। তাঁর কলকাতার সোসাইটি ফর প্রিজারভেশন মহানগরীর ঐতিহ্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সত্যজিৎ রায়, রাধারমণ মিত্র, সুকুমার সেন প্রমুখের সঙ্গে তিনি টাউন হল ধ্বংসের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি। অবসরকালীন জীবনে ইনস্টিটিউট অব্ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ-এর নির্দেশক থাকার সময় আমৃত্যু 'ডিকশ্নারি অব্ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' প্রণয়নের কাজে রত ছিলেন। কটনের বই সমেত কলকাতা নিয়ে বহু আকর-গ্রন্থের সম্পাদনার পাশাপাশি এ-সংক্রান্ত নিজের লেখা কিছু গ্রন্থ প্রণয়নও করেছেন তিনি।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হরিদাসবাবু ইতিহাস অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপনার সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে নিরন্তর গবেষণাও চালিয়েছেন তিনি। এ-কাজে পাশে পেয়েছিলেন যোগ্য সহধর্মিণী অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়-কে। এঁদের রচিত ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'The Origins of the National Educational Movement', 'The Growth of Nationalism in India : 1857-1905', 'India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement', 'Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj', 'Sri Aurobindo's Political Thought', 'Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics' ইত্যাদি। তাঁদের রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা-গ্রন্থাবলি : 'জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়', 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ', ''ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ'', ইত্যাদি। মুখোপাধ্যায়-দম্পতি যৌথভাবে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার', 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক' ও 'শ্রীঅরবিন্দ পুরস্কার' সহ বহু সম্মান লাভ করেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হরিদাসবাবু তাঁর 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' নামক মূল্যবান গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাঙালি পাঠক-গবেষকদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রয়েছেন।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯২২-২০০১) : বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে নাট্যজগতের সম্পর্ক উন্মোচনে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর এ-সংক্রান্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' একটি আকর ও মূল্যবান গ্রন্থ।

এছাড়াও 'প্রযোজক-শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ প্রণয়ন ও 'গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থ সংকলনও করেন তিনি। স্বামী প্রমেয়ানন্দ ও স্বামী চৈতন্যানন্দের সঙ্গে যৌথভাবে 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। সহধর্মিণী অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে 'শ্রীশ্রী মা সারদার কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। নাট্যজগতের সঙ্গে নিজেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন নাট্যামোদী এই অধ্যাপক-গবেষক-সুলেখক মানুষটি।

নির্মলকুমার রায় (১৯২৪-২০১০) : বারাসতের কুবেরপুরে জন্ম নির্মলবাবুর। কর্মজীবনে ছিলেন সরকারি চাকুরে। কিন্তু সংগীতে অনুরাগ ছোটোবেলা থেকেই। গান শিখেছেন প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজি মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন তিনি। লেখালেখির অভ্যাস ছিল-ই। এই দীক্ষাই তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য গবেষণায় মনোনিবেশ করেন তিনি। যার ফলে 'চরণ চিহ্ন ধরে' (শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্থল), 'মাতৃতীর্থ পরিক্রমা'-র মতো কোষগ্রন্থ আমরা পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'চণ্ডীদাস' পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়', 'শ্রীশ্রীসারদামাতা লীলামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২১ অক্টোবর, ১৯২৮ - ৬ জুলাই, ২০১৪) : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গবেষক হিসেবে শঙ্করীপ্রসাদ বসু একটি সুপরিচিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্যের কাছে বিবেকানন্দ-চর্চায় প্রেরণা লাভ। বাংলা সাহিত্যে কৃতী এই ছাত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি', 'কবি ভারতচন্দ্র'

প্রভৃতি গ্রন্থে সেই নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। ক্রিকেট নিয়ে তাঁর সাহিত্য-কীর্তিও উল্লেখযোগ্য। যেমন লিখেছেন 'লাল বল লারউড' ইত্যাদি। তবে রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে রম্যভঙ্গিতে তাঁর গবেষণা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (সাত খণ্ডে) , 'নিবেদিতা লোকমাতা' চার খণ্ডে (প্রকৃতপক্ষে পাঁচ), 'স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন তথ্য, নতুন আলো' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও 'রসসাগর বিদ্যাসাগর', 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (দুই খণ্ডে) গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। 'অ্যাকাডেমি', 'আনন্দ', 'বিবেকানন্দ', 'বঙ্কিম' ইত্যাদি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। অবসরের পর গোলপার্কের 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারে' যোগ দেন। ওই প্রতিষ্ঠানে 'Cultural Heritage of India' গ্রন্থের অষ্টম খণ্ড নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

চিত্রা দেব (জন্ম : ২৪ নভেম্বর, ১৯৪৩) : বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্ম তাঁর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয় ছিল মল্লরাজ-সভাকবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের *মহাভারত*। পরবর্তী সময়ে কবিচন্দ্রের *মহাভারত* ছাড়াও, বিষ্ণুপুরী *রামায়ণ*, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল* ও ময়ূরভট্টের *ধর্মমঙ্গল* সম্পাদনা করেছেন একক ও যৌথভাবে। কর্মজীবনে অধ্যাপনা করেছেন, পরে *আনন্দবাজার পত্রিকার* 'গ্রন্থাগার বিভাগে'র গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি-তে নারী-র ভূমিকা নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা : 'অন্তঃপুরের আত্মকথা', 'মহিলা ডাক্তার : ভিন গ্রহের বাসিন্দা' ইত্যাদি। কিশোর-পাঠ্য রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন 'বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন', 'সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান', 'অদ্ভুত যত হাতির গল্প' ইত্যাদি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ। তবে ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের নিয়ে তাঁর রচিত 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় এনে দেয়। ঠাকুরবাড়ি নিয়ে এখনও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করে চলেছেন তিনি।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৮) : দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্ম হুগলি জেলার হরিপালে। অল্প বয়সেই বাবা-মাকে হারিয়ে মামা রাধারমণ নানের আশ্রয়ে মানুষ হন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোটো হলেও জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউটে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) তাঁর চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। ১৯১২ থেকে ১৯২১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এর পর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ন'বছর উপাচার্য পদে ছিলেন। পিএইচ.ডি. ছাড়াও ডি.এস.সি., 'নাইট', মহীশূরের 'রাজরত্নপ্রবীণ' প্রভৃতির উপাধিধারী ছিলেন তিনি। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য 'চলমান বিশ্ববিদ্যালয়' বলে তাঁকে অভিহিত করা হত। ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশিদের চোখে সম্মানিত করেছিল। দর্শনশাস্ত্রের বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা তিনি।

সরোজিনী নাইডু (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ - ১ বা ২ মার্চ, ১৯৪৯) : আদি নিবাস ঢাকার ব্রাহ্মণগাঁ হলেও পিতা ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল হায়দরাবাদে জন্ম। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরে নিজামের বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেতে গিয়ে প্রথমে লন্ডনে ও পরে কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনো করেন। ডাক্তার গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় থেকে সরোজিনী নাইডু হন। তাঁর কন্যা হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। পরবর্তী সময়ে তিনি নানাভাবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৫ সালে নাগপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন। বাগ্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ইংরেজিতে বহু কবিতা-গ্রন্থের প্রণয়িত্রীও তিনি। ইংরেজিতে কবিতা রচনার জন্য 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে সুপরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথম মহিলা হিসেবে তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালীনই তিনি প্রয়াত হন।

পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা (৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ - ৩০ অক্টোবর, ১৯৩৮) : শ্রীহট্টের কসবা বানিয়াচঙ্গে জন্ম পদ্মনাথের। তাঁর প্রকৃতি পদবি ভট্টাচার্য। কৃতী এই ছাত্রটি ১৮৯০ সালে ইংরেজি সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র এই তিন বিষয়ে অনার্স সহ বি.এ. এবং ১৮৯২ সালে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপক থাকাকালীনই হিন্দুসভার কাজে অংশ নেন। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাব্যশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি পান। অসম সেক্রেটারিয়েটে কাজ পেয়ে শিলং গিয়ে *সাহিত্যসেবক* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। নানা সভাসমিতি গঠন করে সামাজিক কাজ ও অধ্যাপনা—এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ১৯২২ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হলেও সরদা আইনের প্রতিবাদে তা ত্যাগ করেন। সারা জীবনে ১৪টি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়াও অসংখ্যা বাংলা ও ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে অজস্র মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৭ অক্টোবর, ১৯৫৪) : সারদাদেবীর দীক্ষিত এই মানুষটি স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত 'বিবেকানন্দ-চরিত' লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। তাঁর সম্পাদিত *নারায়ণ* পত্রিকার সাংবাদিকতা দিয়ে এই পেশায় হাতেখড়ি। পরে সুদীর্ঘ পনেরো বছর *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র (১৯২৬-১৯৪১) সম্পাদক ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। রাজরোষে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। *আনন্দবাজারের* সম্পাদক পদ ছাড়ার পর *স্বরাজ, সত্যযুগ, অরণি* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সুলেখক সত্যেন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্ম 'জওহরলালের আত্মচরিত'-এর বঙ্গানুবাদ।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৪ অক্টোবর, ১৮৯০ - ১৯৫৯) : বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে মেটেরি গ্রামে তাঁর জন্ম। ব্রাহ্ম-সমাজেব সুপ্রসিদ্ধ

গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর খুল্ল পিতামহ। তিনি ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ছিল বদলি-র চাকরি। ১৯১২ সালে রাঁচিতে থাকাকালীন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'র অনুলিখন করে বিখ্যাত হন। তিনি কবিতা, গান, ছোটো গল্প, নাটক ও প্রবন্ধাদিও রচনা করেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি সাপ্তাহিক *দীপালি* ও মেয়েদের জন্য মাসিকপত্র *মহিলা* সম্পাদনা করেন।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (১৯০৯ - ১৮ মে, ২০০১) : রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই বহুমানিত সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিজয়ানন্দ রায়। জন্ম মালদায়। অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাবান এই মানুষটির জীবন বদলে যায় ১৯২৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পর। ১৯৩৩ সালে ব্রহ্মচারী হিসেবে তাঁর বেলুড় মঠে যোগদান। এবং বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী বিরজানন্দের কাছে ১৯৪৩ সালে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের বহু সাক্ষাৎ শিষ্যের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। বেলুড় মঠ ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, গোলপার্কে ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, মহীশূর প্রভৃতি কেন্দ্রে গুরুদায়িত্ব সামলেছেন তিনি। মিশনের রেঙ্গুন সেবাশ্রম, দেওঘর, বৃন্দাবন, উদ্বোধন (বাগবাজার), মুম্বাই ও দিল্লি কেন্দ্রে প্রধানের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অছি হিসেবে নিযুক্ত হন ১৯৭৩ সালে এবং ১৯৮৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হিরণ্ময়ানন্দজি বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

লেখক পরিচিতি-র সংযোজন

সংযোজন-২-এ যাঁর কয়েকটি পত্র নিয়ে *সাহিত্য* পত্রিকার পাতা তোলপাড় সেই শশধর তর্কচূড়ামণির পরিচয়টি এখানে সংযোজিত হল। এঁর পরিচয় দিয়েছেন হারাধন দত্ত (দ্র. *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড)।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮ খ্রী.) : প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী ও হিন্দুধর্মের রহস্য-ব্যাখ্যাতা। জন্ম ফরিদপুর জেলায় মুখডোবাগ্রাম। দেশে যখন খ্রীষ্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মধর্মের আধিপত্য তখন তিনি হিন্দু-ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন। তিনি ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে হরিসভা ও ধর্মসভা স্থাপিত হয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া লেখনী চালনা করেন ও বক্তৃতা দেন। তাঁহার চেষ্টায়

অনেকের হিন্দুধর্মে অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব দূর হয়। ধর্মপ্রচারে অনেকে তাঁহার সহায়তা করেন। মুখ্যতঃ তাঁহার প্রেরণায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা হিন্দুধর্মের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তিনি 'বেদব্যাস' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তিনি সহবাস-সম্মতি (এজ অভ্ কনসেণ্ট : ১৮৯০-৯২) আইনের বিরুদ্ধতা করেন। এই উপলক্ষে 'বঙ্গবাসী' রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১ খ্রী.)। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে তাঁহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে আর তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। অতঃপর কিছুকাল স্বগ্রামে বাস করিয়া বহরমপুরে টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং শাস্ত্রানুশীলন ও গ্রন্থরচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত আছে। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ধর্মব্যাখ্যা' (১৮০৬ শক), 'বেদ বিষয়ে ইংরেজী মতের প্রতিবাদ' (১৮০৭ শক), 'ভক্তিসুধালহরী' (১৮২৯ শক, ২য় সং), 'ভগবদ্গীতা' (১৩১৯, ১১শ সং) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

মানবসভ্যতার অপার বিস্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ। জগৎ ও জীবনের বহু কৃত রীতি-পদ্ধতির নানাবিধ ছকের বাইরে তাঁর অক্ষয় অবস্থিতি আজও নিত্য নতুন পরিপ্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় অস্তিত্বশীল অনেককে। সরল বিশ্বাস অথবা আদ্যন্ত সমপর্ণের ধরন বহির্ভূত আর এক রামকৃষ্ণ-কে খুঁজে পেতেই বক্ষ্যমান বইটির অবতারণা। ইতিহাসনিষ্ঠ কালানুক্রমে এই অনিবার্য পুরুষটির তলাতল অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা তাঁরই মহাজন্মের একশো আশির অভিমুখে।